সৌহার্দ সম্প্রীতি ও মৈত্রীর সেতুবন্ধ

ভারত বিচিত্রা

জুলাই ২০১৬

বরষিত বর্ষা...

১ ॥ ৬ জুন ২০১৬ ঢাকায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ আবদুল হামিদের সঙ্গে হাই কমিশনার শ্রী হর্ষবর্ধন শ্রিংলার সাক্ষাৎ। উল্লেখ্য, জনাব হামিদ ১৯৭১ সালে মেঘালয়ে মুজিব বাহিনির একজন সেক্টর কমান্ডার ছিলেন

২ ॥ ১৯ জুন ২০১৬ ঢাকায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ আবদুল হামিদের সঙ্গে ভারতীয় লোকসভার এমপি শ্রী অভিজিৎ মুখার্জির সৌজন্য সাক্ষাৎ

৩ ॥ ১৮ জুন ২০১৬ ঢাকায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে ভারতীয় লোকসভার এমপি শ্রী অভিজিৎ মুখার্জির সৌজন্য সাক্ষাৎ

৪ ॥ ৮ জুন ২০১৬ জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান ও বাংলাদেশের সাবেক রাষ্ট্রপতি জনাব হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ এবং বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের বিরোধীদলীয় নেত্রী রওশন এরশাদ এমপি আয়োজিত ইফতার ও সান্ধ্যভোজ অনুষ্ঠানে হাই কমিশনার শ্রী হর্ষবর্ধন শ্রিংলা

৫ ॥ ১ জুন ২০১৬ চট্টগ্রামের হোটেল রেডিসন ব্লুতে ভারতের এম এন দস্তুর এন্ড কোম্পানির সঙ্গে বাংলাদেশের জিপিএইচ ইস্পাত লিমিটেডের ইপিসিএম সার্ভিস সংক্রান্ত এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। দস্তুরের যুগ্ম ব্যবস্থাপনা পরিচালক অভিজিৎ দাসগুপ্ত ও জিপিএইচ ইস্পাতের চেয়ারম্যান মো. জাহাঙ্গীর আলম চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন

সৌহার্দ সম্প্রীতি ও মৈত্রীর সেতুবন্ধ

ভারত বিচিত্রা

বর্ষ চুয়াল্লিশ | সংখ্যা ০৭ | আষাঢ়-শ্রাবণ ১৪২৩ | জুলাই ২০১৬

www.hcidhaka.gov.in
Facebook page: /IndiaInBangladesh; @ihcdhaka
IGCC Facebook page: /IndiraGandhiCulturalCentre

Bharat Bichitra
Facebook page: /BharatBichitra

চিলিকা হ্রদের দেশে

পৃষ্ঠা: ৪৪

সূ চি প ত্র

কর্মযোগ
বাংলাদেশে সাড়ম্বরে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক যোগ দিবস উদ্‌যাপন ০৪
সৌহার্দের নতুন দিগন্ত ০৬

প্রবন্ধ
হিগস বোসন আবিষ্কারের লক্ষ্য মানুষের অনন্ত জিজ্ঞাসা? ॥ বিকাশ সিংহ ০৭
আমার মা ॥ মাহবুবুর রহমান ০৯
রাধারমণ জীবনদর্শন ও সংগীতসাধনা বিশ্বজিৎ ঘোষ ১৫
ভগবতী দেবী: বিদ্যাসাগরজননী সরস্বতী রানী পাল ৩৮

অনুবাদ গল্প
পুনর্জাত কন্যা ॥ লক্ষ্মী মেনন ১১

সৌহার্দ
ভারতে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি ১৪

ছোটগল্প
হৃদয়বৃত্তান্ত ॥ রফিকুর রশীদ ১৯
হিমন্ন ময়ূখ ॥ অনন্যা দাশ ৩৩

কবিতা
খান চমন-ই-এলাহি ॥ আশিক সালাম দুলাল সরকার ২৪
শ্রীপর্ণা বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ আশুতোষ ভৌমিক ইন্দ্রাণী দত্ত পান্না ২৫

নিবন্ধ
বরষিত বর্ষা ॥ নাসরীন মুস্তাফা ২৬

ধারাবাহিক
পাসিং শো ॥ অমর মিত্র ২৮
চিলিকা হ্রদের দেশে ॥ দীপিকা ঘোষ ৪৪

শেষ পাতা
গীতা দত্ত ॥ এমিলি জামান ৪৮

২৬

বরষিত বর্ষা

মৌসুমি বায়ু দক্ষিণ এশিয়া এবং ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলের জলবায়ুতে সর্বাপেক্ষা প্রভাব বিস্তারকারী বায়ুপ্রবাহ। গ্রীষ্ম ও শীত মৌসুমে সমুদ্র ও ভূ-পৃষ্ঠের উত্তাপ এবং শীতলতার তারতম্যের ফলে ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মৌসুমি বায়ুপ্রবাহের দিকও পরিবর্তিত হয়। শীত মৌসুমে শুষ্ক মৌসুমি বায়ু উত্তর-পূর্ব দিক (ভূভাগ) থেকে সমুদ্র অভিমুখে প্রবাহিত হয় এবং গ্রীষ্মকালে দক্ষিণ-পশ্চিম (সমুদ্রভাগ) থেকে ভূমি অভিমুখে প্রবাহিত হয়। ধারণা করা হয়, এই মৌসুমি বায়ুচক্রটির সূত্রপাত ঘটে ১ কোটি ২০ লাখ বছর আগে (মধ্য মায়োসিন) হিমালয় পর্বতমালা সৃষ্টির সময় থেকে।

শিল্প নির্দেশক ধ্রুব এষ
গ্রাফিক্স মো. রেদওয়ানুর রহমান
মুদ্রণ ডটনেট লিমিটেড
৫১/৫১এ, পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০। ফোন ৯৫৬২১৯৮

সম্পাদক নান্টু রায়
ফোন ৯৮৫০১৯৩-৭, ৯৮৮৮৭৮৯-৯১ এক্স: ১৪৯
ফ্যাক্স ৮৮-০২-৯৮৮২৫৫৫
e-mail: informa@hcidhaka.gov.in
প্রকাশক ও মুদ্রাকর ভারতীয় হাই কমিশন
বাড়ি নং ২ সড়ক নং ১৪২ গুলশান-১ ঢাকা-১২১২

ভারতীয় জনগণের শুভেচ্ছাসহ বিনামূল্যে বিতরিত ভারত বিচিত্রায় প্রকাশিত সব রচনার মতামত লেখকের নিজস্ব– এর সঙ্গে ভারত সরকারের কোন যোগ নেই
এই পত্রিকার কোনও অংশের পুনর্মুদ্রণের ক্ষেত্রে ঋণস্বীকার বাঞ্ছনীয়

পাঠকের পাতা

দ্বার উন্মোচিত হবে

আমি অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, আপনাদের কার্যালয়ে *ভারত বিচিত্রা* সৌজন্য সংখ্যা প্রাপ্তির তালিকায় আমার নাম লিপিবদ্ধ হওয়ায় আমি যেমন আনন্দিত, তেমনি লেখা পাঠাবার আহ্বান সত্ত্বেও দীর্ঘ ছয় মাস অতিক্রান্ত হওয়ার পর আমার লেখা অযোগ্য বিবেচিত হয়েছে জেনে আমি অত্যন্ত ব্যথিত হয়েছি। তবে আপনাদের মনমত লেখা পাঠাতে পারলে হয়তো আপনাদের বিবেচনার দ্বার উন্মোচিত হবে।

আপনাদের মত বিজ্ঞজনদের উৎসাহে আমার লেখনিকে সুদুরপ্রসারী করতে পারব বলে আমার বিশ্বাস। বেশ কিছুদিন আগে আপনার ই-মেইলে দু'টি গল্প পাঠিয়েছিলাম। জানি না সে-সব হয়তো-বা কালের গহ্বরে হারিয়ে গেছে। তবুও আমি আশাবাদী। *ভারত বিচিত্রা*র সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি রইল আমার গভীর শ্রদ্ধা ও শুভেচ্ছা।

ঝর্না চৌধুরী
পরিদর্শক প্রশাসন
সহকারী পোস্টমাস্টার জেনারেল-এর কর্যালয়
হবিগঞ্জ বিভাগ, হবিগঞ্জ-৩৩০০

নিয়মিত পড়তে চাই

আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগ থেকে বি এ (সম্মান) ও এম এ ডিগ্রি অর্জন করে বর্তমানে একই বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগে এম ফিল গবেষক হিসেবে নিয়োজিত। আমার গবেষণার বিষয় সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণের ধর্মদর্শন। সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ ভারতের ভূতপূর্ব রাষ্ট্রপতি ও দার্শনিক হিসেবে পরিচিত। আমার গবেষণা প্রায় শেষ পর্যায়ে, কিছুদিনের মধ্যে আমি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে আমার অভিসন্দর্ভ জমা দেব। এছাড়া ঢাকা ও জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণামূলক জার্নালে আমার তিনটি লেখা প্রকাশিত হয়েছে। তাছাড়া তথ্য মন্ত্রণালয়ের মাসিক পত্রিকা *সচিত্র বাংলাদেশে*ও আমার একটি লেখা প্রকাশিত হয়েছে। আমি নিয়মিত ভারত *ভারত বিচিত্রা* পড়তে চাই এবং লেখা দিতে চাই।

সজীব কুমার বসু
এম ফিল গবেষক, দর্শন বিভাগ
রুম নং: ২৪৭, জগন্নাথ হল
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১০০০

গবেষণামূলক হওয়ায়

আমি ঢাকাস্থ ভারতীয় হাই কমিশন থেকে প্রকাশিত মাসিক *ভারত বিচিত্রা* পড়তে ইচ্ছুক। পত্রিকাটি গবেষণামূলক হওয়ায় তা পড়ে আমি ভারতের বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক তথ্য-উপাত্ত সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করতে পারি। তা ছাড়া, সামাজিক-সাংস্কৃতিক অনেক বিষয়ের সঙ্গে বাংলাদেশের মিল থাকায় ভারতকে ভালভাবে জানার জন্য *ভারত বিচিত্রা* নিয়মিত পড়া আবশ্যক। তাই সব সময় এর সঙ্গে সংযুক্ত থাকতে চাই।

আমাকে *ভারত বিচিত্রা*র সঙ্গে সব সময় সংযুক্ত রাখার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ জানাচ্ছি।

কাজী নেয়ামুল শাহীন অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত)
সরকারি খুলনা মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট
খালিশপুর, খুলনা-৯০০০

তুলনা নেই

আমরা ভারত বিচিত্রার ভক্ত পাঠক। ভারতবর্ষকে জানতে এবং এর সনাতন ধর্ম, শিক্ষা-সংস্কৃতি, শিল্প-সাহিত্য, জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রভৃতি সম্পর্কে পরিপূর্ণ জ্ঞানলাভে পত্রিকাটির তুলনা নেই। ময়মনসিংহ জেলার ধোবাউড়া উপজেলার পোড়াকান্দুলীয়া গ্রামে প্রতিষ্ঠিত শত বছরের প্রাচীন শ্রীশ্রী শ্মশানকালী মন্দিরের আমি একজন নগণ্য সেবক। আমরা মাঝেমধ্যে *ভারত বিচিত্রা* সংগ্রহ করে পড়ি। কিন্তু নিয়মিত গ্রাহক না হওয়ায় প্রকাশিত সকল সংখ্যা পড়তে পারি না বলে সবসময়ই দুঃখ বোধ করি। সম্প্রতি *ভারত বিচিত্রা*য় দেখলাম নতুন গ্রাহক অন্তর্ভুক্তির বিজ্ঞাপন। নতুন গ্রাহক হিসাবে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার প্রত্যাশায় এ চিঠি লিখছি। ভারতের তীর্থস্থানগুলির মাহাত্ম্য ধারাবাহিক-ভাবে *ভারত বিচিত্রা*য় প্রকাশ করলে বাধিত হব।

উপেন্দ্র সাহা সভাপতি
শ্রীশ্রী শ্মশানকালী মন্দির, পোড়াকান্দুলীয়া বাজার
ডাকঘর– পোড়াকান্দলীয়া, ময়মনসিংহ ২৪১০

অভিভূত

সৌহার্দ সম্প্রীতি ও মৈত্রীর সেতুবন্ধ *ভারত বিচিত্রা* বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে সেতুবন্ধ তৈরি করেছে। আমাদের বন্ধুপ্রতিম দেশ ভারত সম্পর্কে জানতে হলে জনপ্রিয় এই পত্রিকাটি পড়তে হবে। আমি *ভারত বিচিত্রা* পড়তে পেরেছি, এর সম্পর্কে জানতে পেরেছি আমার এক বন্ধুর কল্যাণে– এজন্যে নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করছি। আমার বন্ধু অনিক এই পত্রিকাটির সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দেয়। প্রকাশনাটি পড়ে আমি অত্যন্ত অভিভূত।

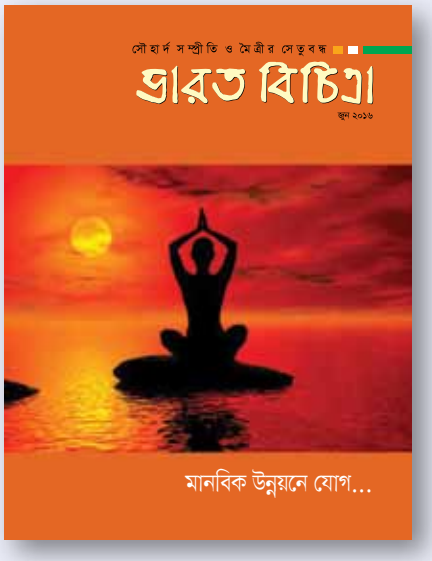

অসম্ভব সুন্দর প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা ও সংবাদে ভরপুর *ভারত বিচিত্রা* পড়ে একদিকে যেমন আনন্দিত হলাম, পাশাপাশি নিজেকে দুর্ভাগা মনে করলাম– এতদিন এর সম্পর্কে জানতাম না বলে। আমার ঠিকানায় প্রতি মাসে প্রত্রিকাটি পাঠানো হলে আমি ভীষণ খুশি হব এবং ভারত প্রসঙ্গে আরো জানতে পারব।

বিগত সংখ্যাগুলো পাঠানো বা সংগ্রহের ব্যবস্থা থাকলে আমি আনন্দের সঙ্গে সে-সব সংগ্রহ করতে চাই।

মোহাম্মদ মহসিন উদ্দিন
৪/২৪ সলিমুল্লাহ রোড, ব্লক ডি
মোহাম্মদপুর, ঢাকা ১২০৭

কোথায় যেন ঘাটতি

ফ্রেন্ডস্ অর্গানাইজেশন প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত গুলিসাখালী সার্বজনীন কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারটি ইউনিয়নের কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থিত হওয়ায় গ্রন্থাগারটি দিন দিন ছাত্র-শিক্ষক-সুধীজন-গুণীজনসহ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষের পদচারণায় মুখরিত হয়ে উঠছে। এর পাঠকবৃন্দ প্রতিদিন বিভিন্ন বই ও পত্র-পত্রিকা পাঠ করে জ্ঞান আহরণ করছে। এখানে ধর্মগ্রন্থসহ বিজ্ঞান, সাহিত্য, ও জ্ঞানমূলক বইয়ের সংখ্যা হাজারখানেকের কম নয়। কিন্তু সৌহার্দ সম্প্রীতি ও মৈত্রীর সেতুবন্ধ *ভারত বিচিত্রা* না থাকায় কোথায় যেন ঘাটতি থেকে যাচ্ছে। চিত্ত বিনোদনের মাধ্যম ও জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধির সহায়ক হিসেবে এটি আবশ্যক বলে আমরা মনে করি। তাই সৌহার্দ সম্প্রীতি ও মৈত্রীর সেতুবন্ধ *ভারত বিচিত্রা* নিয়মিত প্রেরণের জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ রাখছি।

মো. হাফিজুর রহমান সভাপতি
গুলিসাখালী সার্বজনীন কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার
গ্রাম + ডাক– গুলিসাখালী, উপজেলা– মঠবাড়িয়া
পিরোজপুর

সম্পাদকীয়

বর্ষপঞ্জির হিসেবমত আষাঢ়-শ্রাবণ বর্ষাকাল হলেও পৃথিবীর প্রতিবেশগত ভারসাম্য লঙ্ঘিত হওয়ায় আষাঢ় মাসের শেষতক আজও বর্ষার দেখা নেই। আর যদিও থাকে মেঘ-বজ্রের ঘনঘটা, তবু বজ্রপাতের এমনই সমারোহ যে মৃত্যুর শংকা মাথায় নিয়ে বর্ষা উদ্‌যাপন বুঝি বাঙালিকে বাদ দিতে হয়! কাজেই রবিঠাকুর বর্ষা নিয়ে যতই গান বাঁধুন, 'এমন দিনে তারে বলা যায়, এমন ঘনঘোর বরিষায়' বুঝি আর প্রেমিকমনে আলোড়ন তুলবে না। 'বরষিত বর্ষা' নিবন্ধের লেখক তাই বর্ষাবন্দনার পরিবর্তে তাঁর নানা আশংকার কথাই তুলে ধরেছেন। আমরা জানি, মৌসুমি বায়ু দক্ষিণ এশিয়া এবং ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলের জলবায়ুতে সর্বাপেক্ষা প্রভাব বিস্তারকারী বায়ুপ্রবাহ। গ্রীষ্ম ও শীত মৌসুমে সমুদ্র ও ভূ-পৃষ্ঠের উত্তাপ এবং শীতলতার তারতম্যের ফলে ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মৌসুমি বায়ুপ্রবাহের দিকও পরিবর্তিত হয়। শীত মৌসুমে শুষ্ক মৌসুমি বায়ু উত্তর-পূর্ব দিক (ভূভাগ) থেকে সমুদ্র অভিমুখে প্রবাহিত হয় এবং গ্রীষ্মকালে দক্ষিণ-পশ্চিম (সমুদ্রভাগ) থেকে ভূমি অভিমুখে প্রবাহিত হয়। ধারণা করা হয়, এই মৌসুমি বায়ুচক্রটির সূত্রপাত ঘটে ১ কোটি ২০ লাখ বছর আগে (মধ্য মায়োসিন) হিমালয় পর্বতমালা সৃষ্টির সময় থেকে। ভারতীয় উপমহাদেশে গ্রীষ্মকালীন মৌসুমি বায়ু প্রচুর পরিমাণে জলীয় বাষ্প বহন করে আনে। তাই এ অঞ্চলে সে সময় ভারি বৃষ্টিপাত হয়। বিশেষ করে বাংলাদেশ ও ভারতের প্রতিবেশী দেশসমূহে এই বায়ুর প্রভাবে প্রচুর বৃষ্টিপাত ঘটে।

কিন্তু হা হতোস্মি! সেইসব তাত্ত্বিক কথাবার্তা বুঝি বিফলে যায়। এখন আষাঢ়-শ্রাবণকে আর আদৌও বর্ষাকাল বলা যাবে কিনা তা নিয়ে ভুক্তভোগীদের মনে সংশয়ের শেষ নেই।

ঊনবিংশ শতাব্দীর যুগসন্ধিক্ষণে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর জন্মগ্রহণ করেছিলেন। বিদ্যাসাগরের জীবনী সম্বন্ধে অনেক আলোচনা হয়েছে। তাই সেদিকে না গিয়ে 'বৃক্ষ তোমার নাম কি? —ফলেন পরিচয়তে' আপ্তবাক্যটি অনুসরণ করে যে মহীয়সী নারীর কল্যাণে তিনি বিদ্যাসাগর হয়ে উঠতে পেরেছিলেন, সেই জননী ভগবতী দেবী সম্পর্কে এবার আলোকপাত করার চেষ্টা করেছি। রবীন্দ্রনাথ বিদ্যাসাগরজননীর তৈলচিত্র দেখে মন্তব্য করেছিলেন, 'বঙ্গদেশের সৌভাগ্যক্রম এই ভগবতী দেবী এক অসামান্যা রমণী ছিলেন। শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের রচিত বিদ্যাসাগর-গ্রন্থে লিথোগ্রাফ-পটে এই দেবীমূর্তি প্রকাশিত হয়েছিল। অধিকাংশ প্রতিমূর্তিই অধিকক্ষণ দেখার দরকার হয় না। তা যেন মুহূর্তকালের মধ্যে নিঃশেষিত হয়েও যায়। তা নিপুণ হতে পারে সুন্দরও হতে পারে; তথাপি তার মধ্যে চিত্তনিবেশের যথোচিত স্থান পাওয়া যায় না। চিত্রপটের উপরিতলেই দৃষ্টির প্রসর পর্যবসিত হয়ে যায়। কিন্তু ভগবতী দেবীর পবিত্র মুখশ্রীর গভীরতা এবং উদারতা বহুক্ষণ নিরীক্ষা করেও শেষ করা যায় না।' সম্প্রতি বিগত 'মা দিবস' উপলক্ষে পৃথিবীর তাবৎ মায়ের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে আমরা দু'জন মা সম্পর্কে কিঞ্চিৎ আলোকপাত করার চেষ্টা করেছি, আশা করি পাঠকদের ভাল লাগবে।

বাংলাদেশে সাড়ম্বরে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক যোগ দিবস উদ্‌যাপন

২১ জুন, ২০১৬ দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক যোগ দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে ঢাকার মিরপুর ইনডোর স্টেডিয়ামে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতের হাই কমিশনার শ্রী হর্ষবর্ধন শ্রিংলা বলেন, 'এই ভোরবেলায় আমাদের সঙ্গে যোগের টানে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসায় আমরা অত্যন্ত আনন্দিত। সংস্কৃত শব্দ 'যোগ'-এর অর্থ হচ্ছে যুক্ত হওয়া।

এই বিশেষ দিনটি উপলক্ষে বাংলাদেশের রাষ্টপতি মোহাম্মদ আবদুল হামিদ একটি বাণী দিয়েছেন। আমি সেজন্য তাঁকে ধন্যবাদ জানাই। আজকের অনুষ্ঠানে উপস্থিত বাণিজ্য মন্ত্রী জনাব তোফায়েল আহমেদ, যুবমন্ত্রী শ্রী ধীরেন শিকদারকেও ধন্যবাদ জানাই।

জাতিসংঘ টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অনুধাবন করে সুস্বাস্থ্য নিয়ে বেঁচে থাকার ওপর গুরুত্বারোপ করে আন্তর্জাতিক যোগ দিবস প্রবর্তন করেছে। আমি বাংলাদেশের বিখ্যাত তারকা ও গণ্যমান্য ব্যক্তিদের আমাদের মাঝে পেয়ে কৃতার্থ যারা যোগকে পবিত্র ও স্বাস্থ্যসম্মত জীবন প্রণালী হিসেবে গ্রহণ করেছেন। আমি সঙ্গীত তারকা হাবিব ওয়াহিদ, ক্রীড়াবিদ জনাব জাহিদ হাসান এমিলি, অভিনেতা, অভিনেত্রী ও টেলিভিশন ব্যক্তিত্বদের প্রতি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

আমি এই অনুষ্ঠানে বিপুল সংখ্যায় উপস্থিত স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের বিশেষ ধন্যবাদ জানাই। তাদের অনেকে পরীক্ষা রেখে এসেছেন। ড. সুব্রতর নেতৃত্বে এখানে উপস্থিত ডাক্তারদলের প্রতি ধন্যবাদ জানাই, যারা যোগ ও স্বাস্থ্যপ্রদ জীবনচর্যার মধ্যে যোগসূত্র অনুভব করতে পেরেছেন। এছাড়া এ সম্মিলনে উপস্থিত সশস্ত্র বাহিনি, বিজিবি, বিভিন্ন যোগ অনুশীলন সমিতি ও সংস্থার প্রতিনিধিবৃন্দের প্রতি বিশেষ ধন্যবাদ জানাই।

আমাদের অনেকে যারা যোগানুশীলনের সঙ্গে জড়িত, তাঁরা জানেন যে, যোগ প্রায় ৬ হাজার বছরের পুরনো শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক সাধনা যা দেহ ও মনে সঞ্চারিত হয়। যোগের সূচনা ভারতে, তবে আজ সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে।

২০১৪ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৬৯তম অধিবেশনে ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী যোগ সম্পর্কে এক বক্তৃতায় বলেন, 'যোগ দেহ ও মনে, চিন্তা ও কর্মে, সংযম ও পূর্ণতার মধ্যে যোগসূত্র। যোগ মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যে সম্প্রীতি এবং স্বাস্থ্য ও কুশলতার মধ্যে পবিত্র পথ রচনা করে। যোগ শুধু অনুশীলন নয়, আমাদের সঙ্গে একের, বিশ্বের সঙ্গে প্রকৃতির চেতনা আবিষ্কার। জীবনচর্যার পরিবর্তন এবং সচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে যোগ জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় আমাদের সাহায্য করতে পারে।

যোগ দিবসের তাৎপর্য তুলে ধরে বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ আবদুল হামিদ ভারতীয় হাই কমিশনকে দেওয়া এক বাণীতে বলেন, 'ঢাকাস্থ ভারতীয় হাই কমিশন বিশ্বব্যাপী উদ্‌যাপনের অংশ হিসেবে ২১ জুন ২০১৬ ঢাকায় দ্বিতীয় বিশ্ব যোগ দিবস উদ্‌যাপন করতে যাচ্ছে শুনে আমি আনন্দিত। এই সর্বজন বিষয়কে সারা বিশ্বে তুলে ধরার জন্যে আমি ভারত সরকারের প্রশংসা করি এবং আশা করি যোগ এবং এর কার্যকরী ফলকে জনপ্রিয় করতে ভারত সরকার সুদূরপ্রসারী পদক্ষেপ নেবে।

জাতিসংঘ ২০১৪ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর ২১ জুনকে আন্তর্জাতিক যোগ দিবস হিসেবে ঘোষণা করে। এর মধ্য দিয়ে জাতিসংঘ এবং বিশেষ করে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় এই সুপ্রাচীন অনুশীলনের ঐতিহাসিক উপকারিতা এবং জাতিসংঘের মূল্যবোধ ও নীতির সঙ্গে এর অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ককে স্বীকৃতি দিয়েছে।

ভারত এই অনুশীলনের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি এবং অধিকতর সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে এর প্রচারণা জোরদার করেছে। বাংলাদেশ বিশ্ব যোগ দিবস সংক্রান্ত জাতিসংঘের প্রস্তাবের অন্যতম

সমর্থক এবং একে সর্বান্তঃকরণে সমর্থন দিয়েছে।

যোগ একটি প্রাচীন অনুশীলন যা শরীর মন, চিন্তা ও কাজে সমন্বয় সাধন করে এবং সাধারণ স্বাস্থ্য ও কল্যাণের লক্ষ্যে পবিত্র ধারণা তৈরি করে। আজ সারাবিশ্বে বিভিন্ন কায়দায় যোগ অনুশীলিত হচ্ছে এবং এর জনপ্রিয়তা দিনদিন বাড়ছে। 'আন্তর্জাতিক যোগ দিবস'-এর লক্ষ্যে হচ্ছে যোগানুশীলনের বহুবিধ উপকারিতা সম্পর্কে বিশ্বব্যাপী সচেতনতা গড়ে তোলা।

এ উদ্যোগ গ্রহণের জন্য আমি ভারতীয় হাই কমিশনকে অভিনন্দন জানাই। আমি নিশ্চিত যে, এই অনুষ্ঠান অংশগ্রহণকারীদের যোগনুশীলন এবং প্রত্যেকের জীবনে যোগের ইতিবাচক প্রভাব সম্পর্কে জানতে একটা চমৎকার সুযোগ গ্রহণ করে দেবে। ঢাকায় দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক যোগ দিবসের সার্বিক সাফল্য কামনা করি।'

আজকের দিনে সার্বিক উন্নয়নের বিষয়ে সকলেই আগ্রহী। কেউই পিছনে পড়ে থাকতে চায় না। তবে উন্নয়নের সামনে, পিছনে এবং বর্তমানে বিদ্যমান মানবিক উন্নয়নের বিষয়টি প্রায়ই অবহেলিত থেকে যায়। কারণ আর কিছুই নয়– মানবিক উন্নয়নের সঠিক, সার্বজনীন যোজনার নীল নকশার অভাব। আমাদের দরকার নীরোগ, সুস্থ সবল দেহ এবং পর্যাপ্ত ক্ষমতাসম্পন্ন মন। প্রয়োজন প্রকৃতির সঙ্গে, পরিবেশের সঙ্গে, প্রতিবেশীর সঙ্গে তথা বিশ্বমানবতার সঙ্গে আর্থিক যোগ। প্রয়োজন মানুষের সঙ্গে মানুষের যোগ, জীবনের সঙ্গে জীবনযাপনের যোগ এবং বর্তমান জীবনের সঙ্গে মহত্তম আদর্শের যোগ। এই সবকটি প্রয়োজন পরিপূর্ণভাবে মেটাবার যোজনায় যোগের ভূমিকা অনস্বীকার্য। যোগ আমাদের জীবনকে নানাভাবে ফলপ্রসূ করে তোলে, একটি পরিশীলিত জীবনশৈলী হিসেবে ছঁধষরঃু ড়ভ ষরভব পর্যাপ্ত পরিমাণে বৃদ্ধি করে, আমাদের জীবনকে একটি শাশ্বত লক্ষ্যের দিকে নিয়ে যায় এবং আন্তরের আলোয় উদ্ভাসিত করে রাখে।

যখন প্রচলিত এবং অধুনা অপ্রচলিত ধর্মসমূহের উদ্ভব ঘটেনি, মানুষের মানসিক প্রয়াস ছিল মুক্ত বিহঙ্গের মত নাভোচারী, কোন নির্দিষ্ট বিধিনিষেধের আরোপিত বন্ধনে আবদ্ধ নয় তখন এই উপমহদেশের কতিপয় আত্মনিষ্ঠ জিজ্ঞাসুর জীবনব্যাপী প্রয়াসের ফসল হল যোগ– যা ভারতীয় সংস্কৃতির সর্বোত্তম নির্যাস, সামগ্রিকভাবে সমস্ত মানুষের আপন আপন উন্নয়নের সার্বজনীন সোপান। হাজার হাজার বছর পূর্বে আবিষ্কৃত এই যোগ বিদ্যার ফল্গুধারাটি ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়েছে কিন্তু লুপ্ত হয়ে যায়নি। সম্প্রতি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর উদ্যোগে জাতিসংঘ ২১ জুন তারিখটি আন্তর্জাতিক যোগ দিবস হিসেবে ঘোষণা করেছে। ২০১৫ সালে সমগ্র পৃথিবীতে প্রথমবারের মত দিবসটি সাগ্রহে পালিত হয়। গত বছরের মত এবারও দিনটি বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে ঢাকা, রাজশাহী ও চট্টগ্রামসহ বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে সাড়ম্বরে পালিত হয়েছে।

• নিজস্ব প্রতিবেদন

২১ জুন ২০১৬ চট্টগ্রাম (প্রথম ৪টি ছবি) ও রাজশাহীতে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক যোগ দিবস উদ্‌যাপন

সৌহার্দের নতুন দিগন্ত...

সিল্ক সিটি এক্সপ্রেস-এর উদ্বোধন

২৫ জুন ২০১৬ বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভারতীয় অর্থঋণে এবং ভারতীয় নতুন বগিতে সজ্জিত ঢাকা-রাজশাহী রুটে নতুন ট্রেন সার্ভিস (সিল্ক সিটি এক্সপ্রেস)-এর উদ্বোধন করেন। এই ট্রেনটিতে অ্যালুমিনিয়ামের তৈরি ১২টি নতুন বগি (২টি এসি চেয়ার কার, প্রথমে থাকা ২টি এসি কোচ, ৬টি নন এসি চেয়ার বগি এবং ২টি পাওয়ার কার) রয়েছে। ট্রেনটি এলএইসবি প্রযুক্তিতে এবং ডিস্ক ব্রেকসহ ফিয়াট বডিতে তৈরি। যাত্রীদের জন্য এই ট্রেনটিতে একটি এসি পেনট্রি, নন এসি চেয়ার বগি ও আরো সুযোগ-সুবিধা রয়েছে। এই কোচগুলি পাঞ্জাবের কপুরথলা ভারতীয় রেল কোচ কারখানায় তৈরি হয়। ১২০টি বগির মধ্যে ইতোমধ্যে ৬০টি বগি এসে পৌঁছেছে। বাকি বগিগুলি ২০১৬ সালের ডিসেম্বর মাসের মধ্যে পৌঁছে যাবে বলে আশা করা যাচ্ছে

ঢাকায় ভারতীয় কর্মকর্তাদের কর্মব্যস্ত দিন...

২৪ জুন ২০১৬ ভারতীয় অর্থঋণে নির্মিতব্য বাংলাদেশের ২য় ভৈরব সেতু পরিদর্শন করেন অর্থ উপদেষ্টা ড. সুমিত জেরাথ ও যুগ্ম সচিব শ্রী অজিত গুপ্তে। তাঁদের সঙ্গে হাই কমিশনার শ্রী হর্ষ বর্ধন শ্রিংলা উপস্থিত ছিলেন

একই দিনে অর্থ উপদেষ্টা ড. সুমিত জেরাথ, যুগ্ম সচিব শ্রী অজিত গুপ্তে ও হাই কমিশনার শ্রী হর্ষ বর্ধন শ্রিংলা তিতাস সেতুর নির্মাণ অগ্রগতি পরিদর্শন করেন। ভৈরব এবং তিতাস সেতুর নির্মাণককাজ এ বছরের ডিসেম্বর নাগাদ শেষ হবে বলে আশা করা যাচ্ছে

একই দিনে তাঁরা আখাউড়া-আগরতলা রেল সংযোগ নির্মাণকাজের অগ্রগতি পরিদর্শন করেন

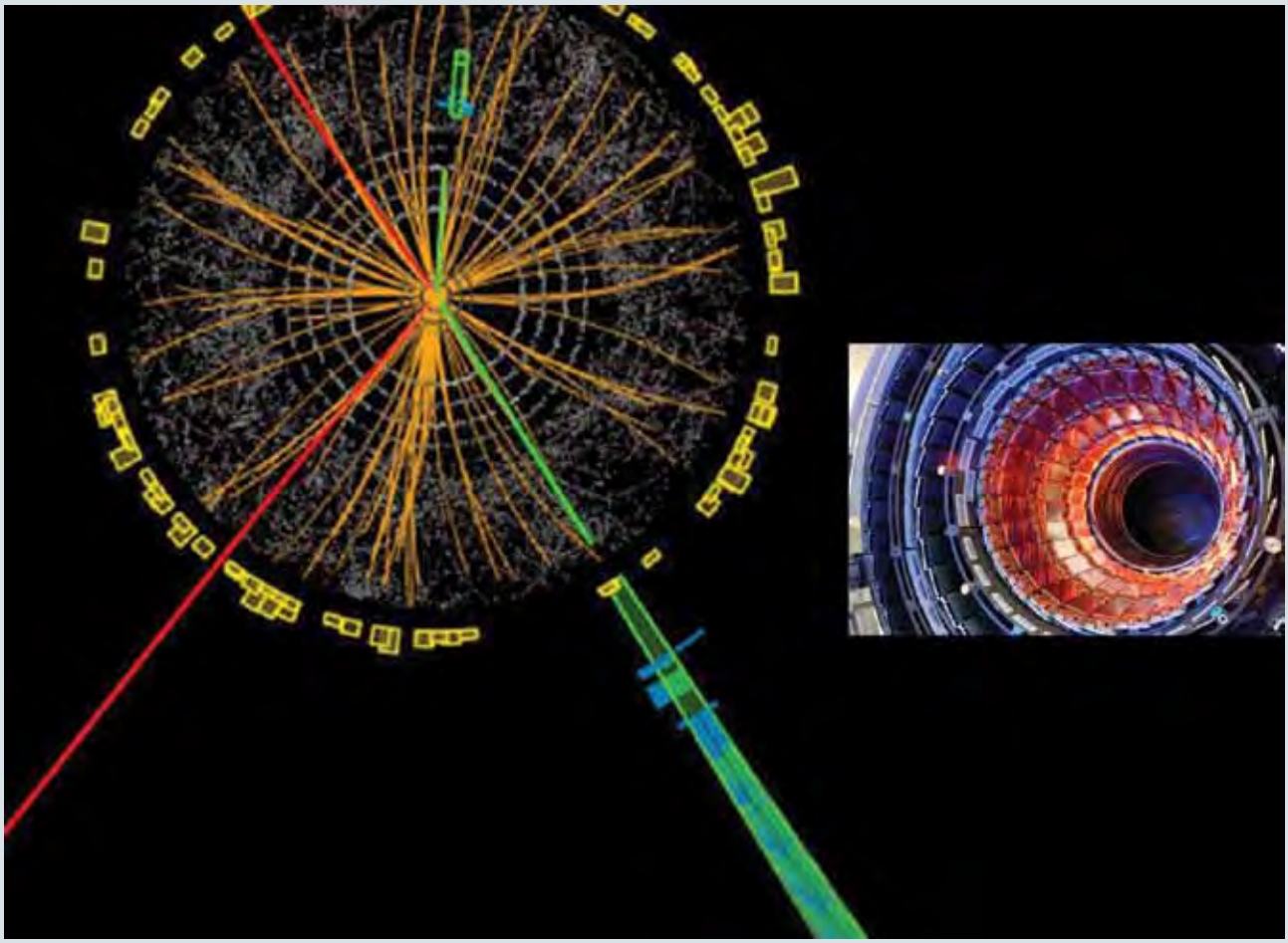

প্রবন্ধ

হিগস বোসন আবিষ্কারের লক্ষ্য– মানুষের অনন্ত জিজ্ঞাসা?

বিকাশ সিংহ

২০১২ সালের জুন মাসে সার্ন-এর এক অনুষ্ঠানে গিয়েছিলাম। ভারত সার্ন-এর অ্যাসোসিয়েট মেম্বর হল, সেই প্রেক্ষিতে। অত ব্যস্ততার মধ্যে ইউরোপের সামান্য পরমাণু গবেষণা কেন্দ্র সার্ন-এর কর্ণধার রলফ্ হইয়ার মধ্যাহ্নভোজের সময় চোখ টিপে বললেন, 'প্রায় পৌঁছে গেছি'। পদার্থবিদ্যার সব থেকে বড় সম্মেলন মৌলিক কণার উপর, অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্নে। কিন্তু সার্ন-এর কাউন্সিলের সদস্যরা পরিষ্কার শুনিয়ে দিয়েছিলেন যে, ঘোষণা সার্ন থেকেই হবে। ৪ জুলাই ২০১২ সেই ঘোষণা হল। দুপুর দেড়টায় খবর এল আমাদের ভিইসিসি-র অন লাইন প্রজেকশনে– তাকে পাওয়া গেছে, সিএমএস বলেছে, ১২৫ জিইভি মত ভর। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই অ্যাটলাস একই ঘোষণা করল। আমাদের জীবনে সেরা মুহূর্ত।

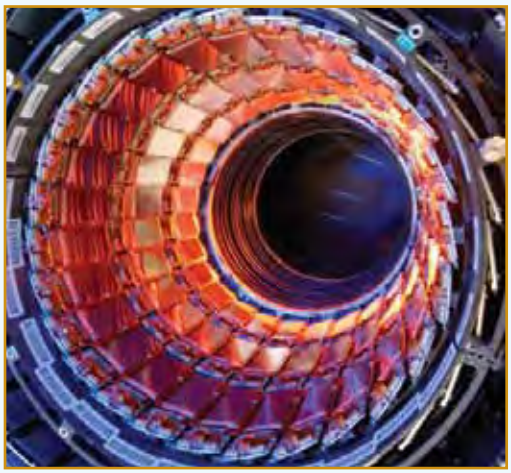

সত্যেন বোসের আবিষ্কার এতই মৌলিক যে, তাঁর সাংখ্যায়নের আয়ত্তে যে কোনও মৌলিক কণা পড়বে, তারা হবে বোসন। সত্তরের দশকের শেষের দিকে সালাম, ওয়াইনবার্গ, গ্লাশো ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, মৌলিক কণা ডব্লিউ এবং জেড বোসন। সেটার আবিষ্কারও হয় সার্নে আর গত বুধবার, ৪ জুলাই ২০১২ সার্নেই হিগস বোসনের সব ধর্ম নিয়েই এক বোসন দেখা দিল।

পিছিয়ে চলুন প্রায় নব্বই বছর। রমনা, ঢাকা, পূর্ববঙ্গ, ১৯২৪। তিরিশ বছরের যুবক সত্যেন্দ্রনাথ বসু অসাধারণ একটি মৌলিক গবেষণার লিপি পাঠালেন স্বয়ং অ্যালবার্ট আইনস্টাইনকে। আইনস্টাইন মুগ্ধ। নিজের বক্তব্যটি লিখে জার্মান ভাষায় অনুবাদ করে *জাইটসস্ক্রিফ্ট ফুর ফিজিক* পত্রিকায় পাঠিয়ে দিলেন। আবিষ্কার হল বোস-আইনস্টাইন সাংখ্যায়ন। যে কোনও মৌলিক কণা, যার স্পিন (একটি কোয়ান্টাম নম্বর) শূন্য কিংবা এক, তারা এই সাংখ্যায়ন মেনে চলবে। তাদের বলা হবে বোসন। আলোর কণা ফোটন, কিন্তু ফোটনের স্পিন ১। তাই তারা বোসন। পিটার হিগস নামে যে কণা, তার স্পিন শূন্য, তাই তারা হিগস বোসন।

সত্যেন বোসের আবিষ্কার এতই মৌলিক যে, তাঁর সাংখ্যায়নের আয়ত্তে যে কোনও মৌলিক কণা পড়বে, তারা হবে বোসন। সত্তরের দশকের শেষের দিকে সালাম, ওয়াইনবার্গ, গ্লাশো ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, মৌলিক কণা ডব্লিউ এবং জেড বোসন। সেটার আবিষ্কারও হয় সার্নে। ৪ জুলাই, ২০১২ বুধবার সার্নেই হিগস বোসনের সব ধর্ম নিয়েই এক বোসন দেখা দিল।

আমি আর আমার কয়েকটি বৈজ্ঞানিক বন্ধু (তার মধ্যে অন্যতম ভাস্কর দত্ত পরলোকগত) ১৯৮৪ সাল থেকে সার্নে যাতায়াত শুরু করেছি। ১৯৮৩ সালে একটি মৌলিক গবেষণা লেখার সুবাদে কোয়ার্ক গ্লুয়ন প্লাজমার জগতে ঢুকে পড়ি। আমরা সার্নের *অ্যালিস* ডিটেক্টরের যৌথ বৈজ্ঞানিকগোষ্ঠীর প্রথম সারিতে। ১৯৮৮ থেকে লাগাতার আমাদের কৃতী ছাত্ররা সার্নের লার্জ হ্যাড্রন কোলাইডার (এলএইচসি)-এও কাজ করে যাচ্ছেন। নাম কুড়িয়েছেন যথেষ্ট। অনায়াসে বলা যেতে পারে পৃথিবীর মধ্যে তারা এখন সেরা। ভিইসিসি এবং সাহা ইনস্টিটিউট অ্যালিসের সঙ্গে যুক্ত। একটার পর একটা নতুন নতুন আবিষ্কার করার পিছনে ছাত্রদের অবদান যথেষ্ট।

সার্নকে এক হিসেবে বলা যেতে পারে বোসনের কারখানা– বোসন ফ্যাক্টরি। সার্নের এলএইচসি-তে দুটি নিউক্লিয়াসের যখন সংঘাত হয় প্রচণ্ড গতিতে, তাপমাত্রা সূর্যের বুকের তাপমাত্রার প্রায় দশ হাজার গুণ। নিউট্রন, প্রোটন আর মেসন দিয়ে নিউক্লিয়াস, গভীর চাপে কিংবা তাপে নিউট্রন প্রোটন গলে তাদের মধ্যে লুকিয়ে থাকা কোয়ার্ক এবং গ্লুয়ন বেরিয়ে পড়ে। সৃষ্টি হয় কোয়ার্ক গ্লুয়ন প্লাজমা। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির (বিগ ব্যাং) এক সেকেন্ডের দশ লক্ষ ভাগের এক ভাগ পরে ব্রহ্মাণ্ডের চেহারাটা আর ওই সার্নের সৃষ্ট কোয়ার্ক গ্লুয়ন প্লাজমা প্রায় একই ধরনের, বলা যেতে পারে একটা আরেকটার প্রতিবিম্ব। ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির এক সেকেন্ডের এক লক্ষ কোটি ভাগের এক ভাগ পরেই হিগস ফিল্ড ব্রহ্মাণ্ডে নেমে পড়েছে, আর ১ সেকেন্ডের দশ ভাগের এক ভাগ পরেই কোয়ার্ক, গ্লুয়ন, ইলেকট্রন, নিউট্রন ব্রহ্মাণ্ডের গর্ভে জন্ম নিল।

হিগস ফিল্ড কী? তার আগে বলি, এডিনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক পিটার হিগস ১৯৬০ সালে এই মৌলিক কণা সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। এখন এই যে মৌলিক কণাগুলি, বিশেষত কোয়ার্ক, তাদের ভর কোথা থেকে এল? সেই ১৯৬৪ সাল থেকে এই গভীর প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা চলছে, কিন্তু 'মেলেনি উত্তর'। খোঁজ চলছিলই। এবার হিগস বোসন-এর মাহাত্ম্য একটু সরল ভাষায় বোঝাই। ধরুন একঘর লোক, সাংবাদিক, বিশেষত সাংবাদিক, কিছু রাজনীতির লোক, কিছু এলেবেলে লোক। মহারাজ হিগস ঘরে ঢুকলেন, সাংবাদিকরা ছেঁকে ধরলেন, তাঁর চারিপাশে লোক জমে গেল– ভর বাড়তে শুরু করল, হিগস বোসন মধ্যিখানে। আবার ধরুন ওইরকমই একঝাঁক লোক উত্তেজনায় ফেটে পড়ল, আলোচনা বিতর্কে নেমে পড়ল– হিগস ফিল্ড।

কোথায় হিগস বোসন? কেন ডব্লিউ এবং জেড বোসন? ব্রহ্মাণ্ড কী দিয়ে তৈরি? ব্ল্যাক হোল কী? গ্যালাক্সি কী করে হল? কত প্রশ্ন। ১৫০০ কোটি টাকা খরচা করে লার্জ হ্যাড্রন কোলাইডার তৈরি করা হয়েছে মূলত মানুষের মৌলিক গবেষণার চাহিদা মেটাবার জন্যই। ওই কোলাইডার তৈরি করতে গিয়ে মানুষ প্রযুক্তিজগতের একেবারে শেষ জায়গায় গিয়ে পৌঁছেছে।

এই প্রযুক্তি একদিন না একদিন মানুষের কাজে লাগবেই; যেমন সার্ন-এ তৈরি ডব্লিউডব্লিউডব্লিউ থেকেই তৈরি হল ইন্টারনেট। এলএইচসি-র গ্রিড কম্পিউটিং একদিন বাজারে নামবে, যোগাযোগ ব্যবস্থা কম করে হলেও পঞ্চাশ থেকে একশোগুণ তাড়াতাড়ি হবে। কিন্তু ইতিহাসে দেখা যায়, মানুষের আসল লক্ষ্য এসব নয়। আসল লক্ষ্য অজানাকে জানা। আরও অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে হবে। ভবিষ্যৎ জ্বলজ্বল করছে। তবে কী জানেন, এই খাওয়াখাওয়ির জগতে, দিনগত পাপক্ষয়ের ভয়ানক যুক্তিহীন অস্তিত্ব, হিংসা, লোভের মাঝে হিগস বোসনের আবিষ্কার ধ্রুবতারার মত স্নিগ্ধ। ব্যক্তিগতভাবে বলতে পারি, আমি খুশির ওপরেও খুশি। পিটার হিগস আবার আমার কলেজেরই ছাত্র– কিংস কলেজ, লন্ডন।

একটা গল্প বলি। ১৯৭৯ সালে পিটার হিগস এক সন্ধ্যায় এডিনবার্গ যাচ্ছিলেন। একজন প্রশ্ন করলেন, হিগস বোসনের বৈশিষ্ট্য বা গুরুত্ব কী? পিটার হিগস নম্রভাবেই বলেছিলেন, 'ইট উইল বি আ রিলিফ, ইট'স বিন আ লং জার্নি।' আরেকটা প্রশ্ন ছিল, 'যদি হিগস বোসন না পাওয়া যায়?' উত্তরে বলেছিলেন, 'ইট উইল বি আ ট্রিমেনডাস রিলিফ, দ্যাট আই ওয়াজ রং আফটার অল'। ছবিতে দেখে মনে হল বৃদ্ধ বেশ খুশি।

আর সত্যেন বোস? আমার মতে, তিনি অনেক নোবেলেরও ঊর্ধ্বে। আরে বাপরে, প্রত্যেক বছরই তো একজন পদার্থবিদ্যায় নোবেল প্রাইজ পান। কিন্তু যত দিন মানবসভ্যতা থাকবে ততদিনই বোসন থাকবে।

বিকাশ সিংহ
ভারতের বিশিষ্ট পদার্থবিজ্ঞানী

[*সৃষ্টি ও সৃষ্টি : বন্ধনহীন গ্রন্থি* (২০১২) বইয়ে সঙ্কলিত এ প্রবন্ধটি ২০১২ সালের ৮ জুলাই *আনন্দবাজার পত্রিকায়* প্রকাশিত হয়]

প্রবন্ধ

আমার মা

মাহবুবুর রহমান

দিনাজপুর শহর থেকে মাইল কয়েক দূরে পুনর্ভবা নদী পেরিয়ে একটু পশ্চিমে এগিয়ে গেলে জগতপুর। ছায়া সুনিবিড় শান্তির নীড় পাখি ডাকা গাছে ঢাকা শ্যামলে শ্যামল নিলীমায় নীল একটি গ্রাম। জগতপুর আমার জন্মস্থান। আমার গ্রাম। এ জগতের আলো আমার চোখে প্রথম প্রতিভাত হয় এই জগতপুরে। আমি জগতপুরের ভূমিতেই প্রথম জগত দেখি। আমার সবচেয়ে প্রিয় সবচেয়ে আপন সবচেয়ে কাছের হৃদয়ের প্রাণের মানুষ আমার স্নেহময়ী জননী এই জগতপুরের মানুষ। তাঁরই জঠর থেকে আমার উৎপত্তি– তিনি আমার জীবনপ্রবাহের উৎসমুখ, আমার মানসসরোবর।

সৃষ্টিকর্তার অসীম অনুগ্রহ ও আশীর্বাদে আমার মা বেঁচে আছেন। প্রাণ ভরে বেঁচে আছেন। বাঁচার আনন্দে বেঁচে আছেন। আশেপাশের পাড়াপড়শি আত্মীয়স্বজন সবাইকে নিয়ে বেঁচে আছেন। সবাইকে বাঁচতে প্রেরণা দিচ্ছেন, সাহস জোগাচ্ছেন।

তিনি কথা বলছেন, গল্প শোনাচ্ছেন। কত কাহিনি যে তিনি জানেন। সুদূর অতীতের কত ইতিহাস, কত ঘটনা। সেই ব্রিটিশ আমল, তখন ছিল রূপোর টাকা আর তাতে ছিল রাজার টাক মাথার ছাপ। তখন গোরা সাহেবদের কি দাপট! তারা ঘোড়ায় চড়ে আসত। সঙ্গে অনেক লোক লস্কর। তখন মাঝে মাঝে গ্রামে কলেরার মহামারী হত; গ্রামকে গ্রাম উজাড় হয়ে যেত। তখন টিউবওয়েল ছিল না। পাতকুয়া আর পুকুরের পানিই ছিল মানুষের সম্বল। মানুষ বলত দেও এসেছে। বাড়ির দরজায়-জানালায় লম্বা লম্বা লাল মরিচ লাইন করে ঝুলিয়ে রাখত, যেন দেও ঢুকতে না পারে।

ঘুঘুডাঙা জমিদার-পরিবারে মায়ের জন্ম। ছোট্টবেলায় বিয়ে হয়েছিল। বধূবেশে হাতির পিঠে চড়ে জগতপুরে শ্বশুরবাড়িতে আসা। ছোটবেলায় মায়ের কাছে গল্প শুনেছি। গ্রামাঞ্চলে তখন অনেক জঙ্গল ছিল। বসতিও কম ছিল। রাতে নিকষ অন্ধকারে ডাকাত পড়ার ঘটনা ঘটত। ডাকাতরা দলবেঁধে দৈত্যের মুখোশ পরে মশাল জ্বালিয়ে বড় বড় গৃহস্থ বাড়িতে হানা দিত। মারধর করে রক্তপাত ঘটিয়ে লোহার সিন্দুক উজাড় করে টাকা-পয়সা, সোনা-রূপা, গয়না-গাঁটি লুঠ করে জঙ্গলে উধাও হয়ে যেত। আমাদের বাড়িতে বাবার একটি দোনলা বন্দুক ছিল। বাবা ভাল শিকারী ছিলেন; শিকার করতে খুব

পছন্দ করতেন। পাখি শিকারে প্রায়ই নদী, বিল, বন-জঙ্গল, দূর-দূরান্তে যেতেন। আমার মনে পড়ে একবার হাতির পিঠে চড়ে আমি তাঁর সঙ্গে বাঘ শিকারেও গিয়েছিলাম।

একবার আমাদের বাড়িতে এক অমাবশ্যার ঘোর অন্ধকার রাতে ডাকাত পড়ে। বাবা কলকাতায় কোন কাজে গিয়েছিলেন। বাড়িতে মা আর আমরা ক'জন ছোট ভাইবোন। গভীর রাতে আমরা টের পেয়ে দেখছি মশাল জ্বালিয়ে ডাকাতরা আসছে। বাড়ির একটু দূরে পুকুরপাড়ে তারা জড় হয়েছে। সকলের মুখে দৈত্যের মুখোশ। মাকে কখনো আগে বন্দুক ধরতে দেখিনি। তিনি বন্দুক চালাতে জানতেন না। কিন্তু সে রাতে কি অবাক ব্যাপার, তিনি এতটুকু ভয় পেলেন না। সাহস করে বন্দুক হাতে নিয়ে দু'দুটো গুলি দুই নলে ভরে নিলেন। তারপর জানালার কাছে দাঁড়িয়ে পুবদিকে সেই পুকুরপাড় লক্ষ্য করে গুলি ছুড়লেন। প্রথমে একটি। পরে আরেকটি। নিষুতি নিস্তব্ধ রাতে বিশাল শব্দ হল। ডাকাতরা সব মশাল নিভিয়ে পালিয়ে গেল। মা আমাদের নিরাপদ করলেন। গ্রামবাসী সবাই মাকে ধন্য ধন্য করতে লাগল। সাহসিকা মা আমার! আমাদের নিরাপত্তা– আমাদের নির্ভরতা।

পরিবারে বিপদে-আপদে অসুখে-বিসুখে মাকে কখনও ভয় পেতে দেখিনি। অসীম ধৈর্য্যশীলা তিনি– সবাইকে ধৈর্য্য ধরতে বলতেন। বলতেন সব ঠিক হয়ে যাবে। আল্লাহ সব ঠিক করে দেবেন। তিনি জানমালের মালিক। সারা জাহানের মালিক। ভয় কীসের? মায়ের চোখে কখনও হয়তো জল দেখেছি, মুখ মলিন হতে দেখেছি, কিন্তু কখনও তাকে শব্দ করে কাঁদতে দেখিনি। তাঁর কান্নার আওয়াজ কখনও শুনিনি। নীরবে চোখের জল বিসর্জন করেছেন, চোখ মুচেছেন, কখনও অধীর হননি। মুখ বুজে সব সহ্য করেছেন। নিজের কষ্টের কথা, যন্ত্রণার কথা, দুঃখের কথা কাউকে বলেননি। রোগে-শোকে কাউকে কখনও বিরক্ত করেননি। সর্বংসহা মা আমার।

আমার দাদী অনেক আগেই মারা গিয়েছিলেন। আমি তখন অনেক ছোট। তাঁকে ভাল করে মনে পড়ে না। আমার ছোটবেলার জগত আমার মাকে ঘিরেই। আর বাবার সংসারটাও তাঁকে ঘিরেই। সংসারের সব দায়দায়িত্ব তাঁকেই পালন করতে হত। ঘর গৃহস্থি, আত্মীয়স্বজনের খোঁজখবর, বাড়ির রান্নাবান্না সব তাঁকে একহাতে সামলাতে হত। কেমন করে করতেন ভাবতে অবাক লাগে। আমরা এগারো ভাইবোন। তিনি সবাইকে একহাতে মানুষ করেছেন।

আমার বাবা ছোটবেলায় বাবাকে হারান। তখন তিনি দিনাজপুরে। জেলা স্কুলের ছাত্র। তাঁর একমাত্র বড়ভাই, তিনিও মারা গেলেন। বাবার আর ম্যাট্রিক দেওয়া হল না। পড়াশুনো ছেড়ে গ্রামে ফিরে এসে সংসারের হাল ধরলেন। দাদা অনেক জমিজমা রেখে গিয়েছিলেন। তিনি ছিলেন একজন বড় জোতদার। সংসারে মন বসাতে আত্মীয়স্বজন মিলে তাঁকে বিয়ে দিয়ে দিলেন। কিশোরীবধূ হিসেবে মা এ বাড়িতে এলেন। বাবা এলাকায় যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন। সংসারের শ্রীবৃদ্ধি করেন, সমৃদ্ধি আনেন। তিনি একাধিকবার ইউনিয়ন কাউন্সিলের চেয়ারম্যান হন। তখন ইউনিয়ন কাউন্সিলকে ইউনিয়ন বোর্ড এবং চেয়ারম্যানকে প্রেসিডেন্ট বলা হত। তখন বাড়ির কাছারিঘর মানুষে ভর্তি। সবসময় গমগম করত। খানাপিনার এলাহি ব্যবস্থা। বাবার জীবনের সাফল্য ও সুখ্যাতির নেপথ্যের যে মানুষটির সবচেয়ে বড় অবদান, তিনি আমার মা। মাকে কখনও বাবার সঙ্গে ঝগড়া করতে দেখিনি। সবসময় শ্রদ্ধা করে কথা বলেছেন। 'আপনি' করে সম্বোধন করতেন। বাবার ইচ্ছা-অনিচ্ছার পুরোপুরি মূল্যায়ন করতেন। বাবাকেও দেখেছি সব সময় মায়ের সঙ্গে সব বিষয়ে আলাপ করতে, তাঁর পরামর্শ নিতে, তাঁর মতামতের দাম দিতে। মাকে কখনও ভুল করতে দেখিনি। ততদিনে আমি দিনাজপুর জেলা স্কুল থেকে প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিক পাশ করে ঢাকা কলেজে ইন্টারমেডিয়েট ভর্তি হয়েছি। বাবার কাছে অনেকে আমার বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে আসতেন। বাল্য বিবাহে মায়ের মত ছিল না। বাবাকে বলতেন, বেটা পড়াশুনো করছে, তাকে পড়াশুনা শেষ করতে দেন। আগে পাশ দিক। বিয়ে-থা পরে দেখা যাবে।

মনে পড়ছে, ১৯৬৩ সালে আমি ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করেছি। হাতে তখন অনেক চাকরি। আমি সব পায়ে ঠেলে সেনাবাহিনিতে যোগদান করেছি। পশ্চিম পাকিস্তানে মিলিটারি একাডেমি কাকুলে যাচ্ছি। বাবা মোটেই রাজি ছিলেন না। মা বেশি মন খারাপ করেননি। আমার প্রতি তাঁর অগাধ বিশ্বাস। তিনি দোয়া করেছেন। সুরা ইয়াসিন পড়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়েছেন। মুখে ফুঁ দিয়েছেন। আমি মায়ের দোয়া সম্বল করে কাকুলে চলে গেলাম। আমার দীর্ঘ জীবনপরিক্রমায় কত ঘাত-প্রতিঘাত এসেছে, চলার পথে কত চড়াই-উৎরাই, কত উথাল-পাথাল– মায়ের দোয়ায় সব পার হয়ে এসেছি, খাদে পড়িনি।

১৯৭৫ সালের ৭ই নভেম্বর সেনাবাহিনিতে অভ্যুত্থান ঘটে। আমি তখন ঢাকা সেনানিবাসে একটি ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিটে কর্মরত। বেশ কিছু বিয়োগান্তক দুঃখজনক সহিংস ঘটনা ঘটে। অনেক সেনা অফিসার সহিংসতার শিকার হন। ক্যাপ্টেন মাহবুব নামে একজন অফিসার নিহত হন। খবরটা দিনাজপুরে রটে গেলে মা পাগলপ্রায় হয়ে যান– চিৎকার করে বলতে থাকেন, 'ওর বাপ বারবার না করেছিল। মিলিটারিতে যেতে মানা করেছিল। আমি রাজি করাই। আমার বেটাকে আমিই মেরে ফেলেছি।'

মা তুমি কল্যাণময়ী, মঙ্গলময়ী, তুমি মমতাময়ী। সকল দুঃখকষ্টে তোমার কথা সুধার মত আমার মন জুড়িয়েছে। তোমার হাতের প্রলেপ সব যন্ত্রণা-যাতনা শুষে নিয়েছে। আমি জেগে উঠেছি। সতেজ হয়েছি। মা, প্রিয় মা আমার। কি ঐশ্বরিক শক্তি তোমার! কি যাদু তোমার হাতে!

আমার মা আমাকে মাঝে মাঝে বলেন, বেটা নামাজ পড়িস। আমি অবাধ্য। পাঁচবেলা আমার নামাজ পড়া হয় না। জানি মা কষ্ট পান। মনে হলে আমি তখনই ওজু করে জায়নামাজ বিছাই। নামাজ পড়তে বসে যাই। আল্লাহ আমাকে মাফ করুন।

আমার মায়ের বয়স সঠিক কেউ বলতে পারে না। তিনিও না। সব রকম হিসেবনিকেষ কষে দেখেছি, তাঁর বয়স নব্বইয়ের ঊর্ধ্বে। তিনি বলেন, কবে একশো বছর পার হয়ে গেছে। তাঁর সঙ্গের লোকেরা, তার ভাইবোনেরা, তাঁর কাছের মানুষেরা– কেউ আর বেঁচে নেই। তিনি বলেন, তিনিই নাকি একমাত্র কালের সাক্ষী হয়ে বেঁচে আছেন। এত যে বয়স হল মায়ের, এখনও ঠিক হাঁটতে পারেন, এখনও লাঠি লাগে না। কেউ হাত ধরে চলতে সাহায্য করতে চাইলে রেগে যান। আমার মানা সত্ত্বেও কিছুদিন আগে ঢাকায় আমার ছোটভাইয়ের বাসার ৬তলায় চুপিসারে সিঁড়ি ডিঙিয়ে উঠেছিলেন।

জনপ্রিয় কণ্ঠশিল্পী ফেরদৌস ওয়াহিদের একটি গান আমার খুব প্রিয়– 'এমন একটা মা দে না। যে মায়ের সন্তানেরা কান্দে আবার হাসতে জানে'। কণ্ঠশিল্পী ওয়াহিদকে বলতে চাই, আল্লাহ সত্যি এমন একটি মা দিয়ে আমাকে ধন্য করেছেন যিনি ১১জন সন্তানকে কাঁদতে নয় শুধু হাসতে শিখিয়েছেন। তিনি নিজে কখনও কাঁদেননি, সব সময় শুধু হেসেছেন। সদা হাস্যময়ী মা আমার।

পৃথিবীতে কত লক্ষ কোটি মা আছেন। সকল মা-ই তো মা। ছোট্ট সংক্ষিপ্ত মধুর একটি শব্দ মা। সকলেরই প্রাণের মা। তবুও যেন আমার মনে হয় আমার মা-ই শ্রেষ্ঠ মা, মধুরতম প্রাণতম মা। মা, তুমি চিরজীবী হও। তুমি আশীর্বাদ হয়ে আমার জীবনে সদা প্রবহমান থাক। আমার জীবনধারা সে যে তোমারই ধারা। তোমা হতেই আমার প্রাণবায়ু।

রবীন্দ্রনাথ বাংলাকে ভালবেসেছিলেন। আদর করে সোনার বাংলা নাম দিয়েছিলেন। বাংলার আকাশ বাংলার বাতাস তাঁর প্রাণে বাঁশি বাজিয়েছিল। বাংলামায়ের বদনখানি মলিন হলে তিনি আঁখিজলে ভাসতেন। তাঁর এ অমর কবিতা বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত। বাংলাদেশের সাড়ে ষোল কোটি মানুষের প্রাণের সঙ্গীত। জননী-জন্মভূমি, স্বর্গাদপি গরিয়সী। দুটোই স্বর্গের মত গরীয়ান। স্বর্গের মত মহীয়ান। দুটোই স্বর্গ থেকে বিধাতার আশীর্বাদ হিসেবে মানুষের প্রাপ্তি। আমি আমার মাকে ভালবাসি, ভীষণ ভালবাসি। আমার মা আমার সোনার মা, অমূল্যরতন মণি মাণিক্যের অধিক, আমার মা জননী। আল্লাহ্ তুমি সর্বশক্তিমান। তুমি আমার মাকে ভাল রেখো। সদা হাস্যময়ী রেখো। তাঁর বদনখানি চির অমলিন রেখো। এইটুকু ছোট্ট প্রার্থনা আমার।

মাহবুবুর রহমান লে. জে. (অব.)
সাবেক সেনাপ্রধান

অনুবাদ গল্প

পুনর্জাত কন্যা

লক্ষ্মী মেনন

মিনি উৎসাহের সঙ্গে আঙুলগুলো নাড়িয়ে চিঠিটা টাইপ করে দ্বিধান্বিতভাবে তাতে সই করল। তার সহকর্মীরা বন্ধুভাবাপন্ন, তার বস তার প্রতি স্নেহশীল। 'এটাই আমার প্রথম ও শেষ চাকরি' কথাটা ভাবতে ভাবতে দুঃখ ভারাক্রান্ত মনে পদত্যাগপত্র হাতে মিনি ডিরেক্টরের রুমে ঢুকল।

জগদীশ মেহতা কাজে ব্যস্ত! তাই তিনি মেয়েটির দিকে তাকিয়ে তাকে বসতে বললেন। হাতের চিঠিটা আর একবার পড়ে তাতে সই করে মিনির কথা শোনার জন্যে তিনি হাসি হাসি মুখে তার দিকে তাকালেন।

টাইপ করা পদত্যাগপত্রটিতে শেষবারের মত মিনি চোখ বুলাল। মিনি পদত্যাগপত্রসহ তার বিয়ের নিমন্ত্রণপত্রটি মেহেতাজীর হাতে দিল। হঠাৎ মিনি লক্ষ্য করল, তার বস বেদনার অভিব্যক্তি প্রকাশ করে তাকে স্বাগত জানানোর জন্য হাত বাড়িয়ে দিলেন।

দিন পনেরো পরে একজন নতুন সেক্রেটারি নিয়োগ করার পর মেহতাজীর কাজের চাপ হ্রাস পেল। নতুন সেক্রেটারি ডেইজি নিজেকে একজন দক্ষ সেক্রেটারি হিসেবে প্রদর্শন করার জন্য চেষ্টা করতে থাকল। মেহতাকে দেখে মনে হল, তিনি তার কাজে সব সময়ই অসন্তুষ্ট থাকেন। কিছু দিন পার হওয়ার পর মেহতা বুঝতে পারলেন যে তিনি মিনির মত দক্ষ সেক্রেটারি আর পাবেন না।

মিনি তার ব্যক্তিগত সেক্রেটারি হিসেবে পাঁচ বছর ধরে কাজ করছে। মিনি তাঁকে জানাল যে, একমাসের বাৎসরিক ছুটি কাটিয়ে ফিরে আসার পর দু'সপ্তাহ আগে তার বিয়ের প্রস্তাব এসেছে। গতকাল তার মা তাকে চিঠি দিয়ে জানিয়েছেন যে সব কিছু ঠিকঠাক হয়ে গেয়ে। এখন তাকে কাজে ইস্তফা দিয়ে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বাড়ি ফিরে যেতে হবে।

জগদীশ মেহতা তার দক্ষ সেক্রেটারিকে হারানোর খবরে বিচলিত হয়ে পড়লেও যেন তার বিয়ের খবর শুনে খুশি হয়েছেন সেটাই প্রকাশ করার ভান করলেন। তিনি একদিন অভিজ্ঞতাহীন মিনি নামের সুন্দরী তরুণীকে তার অফিসে ব্যক্তিগত সেক্রেটারি হিসেবে নিয়োগ দিয়েছিলেন। তিনি মেয়েটিতে ওই পদে নিয়োগ দিয়ে দ্বিধান্বিত ছিলেন এই ভেবে যে, সে কি এত বড় দায়িত্ব পালন করতে পারবে। ইন্টারভিউয়ে মেয়েটি অবশ্য খুব ভাল করেছিল। তিনি তার সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে কথা বলে তার ব্যক্তিগত বিষয় সম্বন্ধে অবগত হয়েছিলেন। মিনি বিধবা মায়ের বড় মেয়ে। মিনি ছাড়াও তার আরো তিনটি বোন ও একটি ভাই আছে। ভাইটি স্কুলে পড়ে। কষ্টেসৃষ্টে মিনি স্কুল ফাইনাল শেষ করার পর কম্পিউটার কোর্সে ভর্তি হয়।

দায়িত্বপূর্ণ পদে একটা অনভিজ্ঞ মেয়েকে নিয়োগ দেওয়ার ডিরেক্টরের সিদ্ধান্তের বিষয়ে পারসনেল অফিসার রাজন শেঠ সবাইকে সতর্ক করেছিলেন। মিনি দ্রুত তার যোগ্যতার প্রমাণ দিয়েছিল, ফলে রাজন শেঠের ভয়টা কেটে গিয়েছিল। মিনি খুবই যত্নসহকারে তার কাজ করতে থাকে, আর তার ফলে সে অল্প সময়ের মধ্যে ঊর্ধ্বতনদের আস্থা অর্জন করতে সক্ষম হয়। ডিরেক্টর তার কাজে খুশি ছিলেন। তার একদিনের অনুপস্থিতিতে তিনি অসুবিধায় পড়তেন। দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে মিনি মেহতাজীর মনটাকে যেন পড়তে পারত। বসের মেজাজ-মর্জি বুঝে মিনি সব সময়ই মনযোগ আর সচেতনতার সঙ্গে কাজ করত। এতে মেহতাজী তার উদ্বেগ ও কর্মীদের উপরের রাগ ঝেড়ে ফেলতে পারতেন।

তার ৫০ বছরের কর্মজীবনে মেহতাজী মিনির মত দক্ষ সেক্রেটারি দ্বিতীয়টি পাননি। এক্সিকিউটিভ রোলিং চেয়ারে বসে জগদীশ মেহতা ব্যথিতচিত্তে উপলব্ধি করলেন যে মিনি খুবই দায়িত্বপূর্ণ ছিল, তার অনুপস্থিতে তাকে ভোগান্তির শিকার হতে হবে।

মিনি সে সময় ছুটিতে ছিল। তখন মেহতাজীর কাছে জরুরি কাজে আসা লোকদের কাছে তার ব্যক্তিগত পিয়ন বলত, 'মিনি ছুটিতে থাকায় সাহেবের মনটা খুবই বিষণ্ন'। সে সময় পিয়নটা মনে মনে ভাবল, মিনি ছুটিতে থাকায় মেহতাজী কেন বিচলিত হয়ে পড়েছেন? তার জায়গায় আমি কি আরেকজন ভাল সেক্রেটারি খুঁজে পেতে পারি না? সে ভাল ও দক্ষ একজন সেক্রেটারি নিয়োগের ব্যাপারে তাৎক্ষণিকভাবে চাকরি-সম্পর্কিত এজেন্সির কাছে অনুরোধ করতে পারে।

কাজ ছেড়ে চলে যাওয়ার শেষ দিনে মিনি মেহতাজীর রুমে প্রবেশ করে। সে তার চাবি ফিরিয়ে দিয়ে বিদায় চায়। মেহতাজী তার বিয়ের উপহারস্বরূপ একটা ছোট প্যাকেট দিলে মিনি বিস্মিত হয়। বসের কেবিন থেকে বের হয়ে আসবার সময় মিনি কেঁদে ফেলে।

রুমে ফিরে সিটে বসে সে আগ্রহভরে ছোট প্যাকেটি খুলে তার মধ্যে একটা সোনার ভারী চেন ও একটা চিরকুট পায় যাতে লেখা ছিল, 'প্রিয় মিনি, তোমার সুখী ও দীর্ঘ বিবাহিত জীবন কামনা করি– জগদীশ মেহতা।' বসের লেখা চিরকুটটি পেয়ে মিনি যারপরনাই অবাক হয়।

মিনি কৃতজ্ঞচিত্তে তার সহকর্মীদের দেওয়া উপহার সামগ্রী গ্রহণ করে। মিনি ভাবে, তাদের অজপাড়াগাঁয়ে তার সহকর্মীদের উপস্থিত হওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। উপকারী স্বভাব, মিষ্টি ও নিষ্পাপ হাসির জন্য সে সবার কাছ থেকে ভালবাসা ও শ্রদ্ধা পেয়ে এসেছে। পাঁচটা বছর যাদের সঙ্গে সুখ-দুঃখ, হাসি-আনন্দে অতিবাহিত করেছিল তাদের সে বিদায় সম্ভাষণ জানাল। তার হাত দুটো বিভিন্ন ধরনের প্যাকেটে ভরে গেল। মিনি রুমাল দিয়ে চোখের জল মুছে হাসবার চেষ্টা করল।

দিন পনেরো পরে একজন নতুন সেক্রেটারি নিয়োগ করার পর মেহতাজীর কাজের চাপ হ্রাস পেল। নতুন সেক্রেটারি ডেইজি নিজেকে একজন দক্ষ সেক্রেটারি হিসেবে প্রদর্শন করার জন্য চেষ্টা করতে থাকল। মেহতাকে দেখে মনে হল, তিনি তার কাজে সব সময়ই অসন্তুষ্ট থাকেন। কিছু দিন পার হওয়ার পর মেহতা বুঝতে পারলেন যে তিনি মিনির মত দক্ষ সেক্রেটারি আর পাবেন না। দুর্ভাগ্যক্রমে মেহতাজীর অনেক সহকর্মী তাদের বসের রাগারাগি শুনতে থাকল।

'মিনির মত একজন দক্ষ সেক্রেটারি আমি কি আর পাব?' নিজের মনকে প্রশ্নটা করে তিনি বিস্মিত হলেন। হঠাৎ করে মেহতাজীর মনে পড়ল মিনির বিয়ের নিমন্ত্রণপত্রের কথা, এ উপলক্ষে তাকে তো ছাপানো গ্রিটিং কার্ড পাঠাতে হবে। সচরাচর তার সেক্রেটারিই এ ধরনের গ্রিটিং কার্ড পাঠিয়ে থাকে। তিনি অনুভব করলেন তিনি তার কন্যার বিয়েতে গ্রিটিং কার্ড পাঠিয়েছিলেন। নিজের একমাত্র কন্যা রীনার কথা তার মনে পড়ল। দু'বছর আগে তার বিয়ে হয়েছে। সে তার স্বামীর সঙ্গে বিদেশে চলে গেছে। সেখানে সে সুখেই আছে।

মেহতাজীর মনের কোণে বিয়ের পোশাক পরা মিনির ছবি ভেসে উঠল। তার পরনে ঐতিহ্যবাহী কাঞ্চিপুরম সিল্কের শাড়ি। মা ও ভাইবোনদের বিদায় সম্ভাষণ জানিয়ে সে তার সুদর্শন স্বামীর সঙ্গে চলেছে। রীনা যেমন আশিসকে আলিঙ্গন করেছিল সেইভাবে মিনিও তার ভাইকে আলিঙ্গন করছে। বিয়ের সময় মিনি তার বাবার অভাব অনুভব করছে নিশ্চয়ই, রীনা যেমন তার মায়ের অভাব অনুভব করেছিল। রীনা তার মাকে শৈশবেই হারিয়েছিল। দুর্ঘটনায় প্রিয়তমা পত্নীর মৃত্যুর কথা স্মরণ করে মেহতার চোখদুটো অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠল। 'না...' তিনি আর্তনাদ করে উঠে নিজেকে ধাতস্থ করার চেষ্টা করলেন।

এক সপ্তাহ পরে মেহতাজী মিনির কাছ থেকে একটা চিঠি পাবার প্রত্যাশায় উদগ্রীব হয়ে উঠলেন। 'কেন মিনি আমাকে একটা চিঠি লিখছে না?' হঠাৎ করে অন্য একটা অনুভূতি তার মনের কোণে ভেসে উঠল। এখন সে কেন তাকে চিঠি লিখবে? সত্যিকথা বলতে আমি তো তার বসমাত্র ছিলাম। আমি তো কখনোই তার প্রতি বাবার মত আচরণ করিনি।

মেহতাজী সোমবার সকালে কাস্টম অফিসে যাবার জন্য বাড়ি থেকে বের হচ্ছিলেন। হঠাৎ করে তার মনে পড়ল তার সম্ভাব্য বিদেশ সফর সম্বন্ধে একটা জরুরি চিঠি তো ডেইজিকে ডিকটেড করা হয়নি। 'মিনি যদি থাকত তবে এ বিষয়টা ভেবে ত্রস্ত হতে হত না। সে নিজেই তা টাইপ করে তার সইয়ের জন্য রেখে দিত, নতুবা সইয়ের জন্য আমার বাড়িতে পাঠিয়ে দিত' তিনি মনে মনে আওড়ালেন, 'এই নির্বোধ ডেইজি জানেই না কেমন করে একটা সামান্য চিঠির ড্রাফট করতে হয়। অথচ সে মনে করে তার অভিজ্ঞতা মিনির চেয়ে বেশি।'

মেহতাজী তাৎক্ষণিকভাবে তার ড্রয়িংরুমে ফিরে গিয়ে তার অফিসের

মেহতাজী তোয়ালে বের করে তার কপালের বিন্দু বিন্দু ঘাম মুছলেন। 'তোমার কি আরেকটা মেয়ে আছে, নাকি? আমি তো জানতাম না' শঙ্করান পিল্লাই তার বন্ধুর দিকে তাকিয়ে অবিশ্বাসের সুরে বললেন। 'হ্যাঁ , আমার আরো একটা মেয়ে আছে। আমার স্ত্রী ২২ বছর আগে একটা মেয়ে জন্ম দেন। সেই মেয়েটি মাত্র দশ দিন জীবিত ছিল। সেই মেয়েটি এখন জীবন ফিরে পেয়েছে।'

নম্বরে ডেইজিকে ডায়াল করলেন। তাকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়ে তড়িঘড়ি করে দরজা খুলে মিনিকে দেখে স্থানুর মত দাঁড়িয়ে পড়লেন। তার নিঃশ্বাস যেন বন্ধ হয়ে যাবার উপক্রম...'মিনি...!' তিনি বিড়বিড় করে বললেন।

মিনি একাই তার বাড়িতে এসেছে। তাকে সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত ও ভগ্নোদ্যম মনে হচ্ছে। তার পরনে পুরনো শাড়ি, মুখটা ফ্যাকাশে, তার বয়স যেন আগের চেয়ে দশ বছর বেড়ে গেছে। পরনের পোশাক অপরিচ্ছন্ন, চুলগুলো অবিন্যস্ত। তাকে দেখে মনে হল সে অনেকটা পথ জার্নি করে এসেছে। তার মুখের হাসিতে অস্বস্তির আভাস। মেহতাজীর চোখদুটো যেন মিনির স্বামীকে খুঁজছে।

জগদীশ মেহতা মিনিকে চেয়ারে বসতে বললে সে বসতে ইতস্তত করত। আজ বসবার ঘরের চেয়ারে অবসাদগ্রস্তের মত বসে মিনি তার বিপর্যস্ত মনের কথা অনর্গল বলে চলতে লাগল– 'প্রথম দিকে ওদের সঙ্গে কথা হয়েছিল বিয়ের দু'মাসের মধ্যে বাকি যৌতুক দিতে হবে। কিন্তু হঠাৎ করে আমার হবু শ্বশুর মত বদলিয়ে বিয়ের অনুষ্ঠানের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে সমস্ত যৌতুক দাবি করে বসল, যা আমার মায়ের পক্ষে দেওয়া সম্ভব ছিল না। হবু শ্বশুর আমার হাতে তার ছেলেকে মঙ্গলসূত্র বাঁধতে দিল না। বরকে জোর করে বিয়ের আসর থেকে উঠিয়ে নিয়ে গেল। বিয়ে ভেঙে গেল। আমার মা বিয়ের আসরেই অজ্ঞান হয়ে পড়লে তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হল।' কথা থামিয়ে মিনি আবার বলল, 'মাকে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দিয়েছে।'

এক সময় তার মর্মান্তিক গল্প শেষ হল। মিনি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে তার বসের দিকে তাকাল, তার কাছ থেকে সহানুভূতিসূচক কথা শুনবার আশায়।

মেহতাজী সম্বিত ফিরে পেলেও মিনিকে একটা সান্ত্বনার বাণী শোনাতে পারলেন না। রুমে নীরবতা নেমে এল। এক সময় মিনি আবার নীরবতা ভাঙল, 'স্যার, আমি জানতে এসেছি আমার পোস্টে কাউকে ইতোমধ্যে নিয়োগ করা হয়েছে কিনা, যদি না হয় তবে...' সে মেহতাজীর তাকিয়ে আবার বলল, 'আপনি কি আমাকে ফিরিয়ে নিতে পারেন, স্যার?' মেহতাজী তার সামনে এক মুহূর্ত বসে রইলেন। মাথার উপরে ফুল স্পিডে ফ্যান ঘুরলেও তিনি ঘামছিলেন। তিনি তার আসন থেকে উঠে বললেন, 'মিনি, তুমি ভেতরে গিয়ে বিশ্রাম কর। এখন চাকরি নিয়ে দুশ্চিন্তা কোরো না। আমরা দেখছি কী করতে পারি।' তারপর জগদীশ মেহতা একজনকে ফোন করে নিজের গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে গেলেন।

পনেরো মিনিট পরে মেহতার নীল রঙের গাড়িটি শঙ্করান পিল্লাইয়ের বাংলোর সামনে থামল। 'হ্যালো মেহতাজী, শুভ সকাল।' শঙ্করান পিল্লাই তাকে স্বাগত জানালেন। কুশল বিনিময়ের পর জগদীশ মেহতা তার কাছে আসার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করলেন। 'গতবার আমার রীনার জন্যে একটা পছন্দসই ছেলের ব্যবস্থা তুমি করে দিয়েছিলে। এবার আমি এসেছি আমার দ্বিতীয় মেয়ের বিয়ের জন্য আরেকটা ছেলের খোঁজে।' মেহতাজী তোয়ালে বের করে তার কপালের বিন্দু বিন্দু ঘাম মুছলেন। 'তোমার কি আরেকটা মেয়ে আছে, নাকি? আমি তো জানতাম না' শঙ্করান পিল্লাই তার বন্ধুর দিকে তাকিয়ে অবিশ্বাসের সুরে বললেন। 'হ্যাঁ , আমার আরো একটা মেয়ে আছে। আমার স্ত্রী ২২ বছর আগে একটা মেয়ে জন্ম দেন। সেই মেয়েটি মাত্র দশ দিন জীবিত ছিল। সেই মেয়েটি এখন জীবন ফিরে পেয়েছে।' শঙ্করান পিল্লাই অবাক হয়ে বসে ভাবলেন তিনি যেন কোন ভূতের গল্প শুনছেন।

'তুমি কী বুঝাতে চাচ্ছো? তোমার মৃত মেয়ে আবার জীবন কী ফিরে পেয়েছে!'

মেহতাজী তার চেয়ার শঙ্করান পিল্লাইয়ের কাছে টেনে নিয়ে বিনম্র কণ্ঠে বললেন, 'আমি আমার সেক্রেটারি মিনির কথা বলছি। পর্যাপ্ত যৌতুক দিতে না পারায় বিয়ের আসর থেকে বর উঠে যাওয়ায় মিনির বিয়ে ভেঙে গেছে। তুমি তার জন্য একটা ছেলে পছন্দ করে দাও, সে যা যৌতুক চায় আমি সবই আমি দেব। মিনি তোমার অপরিচিত নয়। তুমি তার সুন্দর ব্যক্তিত্ব আর অন্য গুণাবলীর কথা জানো। আমার যদি বড় ছেলে থাকত তবে আমি তাকে পুত্রবধূ করতে দ্বিধা করতাম না। মিনিকে আমি রীনার বোন বলে মনে করি। তুমি কি তার জন্য একটা ছেলে দেখে দেবে?'

মেহতাজী তার বন্ধুর জবাবের অপেক্ষায় বসে রইলেন। কয়েক মুহূর্ত ভাবার পর শঙ্করান পিল্লাই তার বন্ধুর কাঁধে হাত রেখে বললেন, 'ভয় পেয় না বন্ধু। আমি আমার ছেলের বিয়ের জন্য একটা সুলক্ষণা মেয়ে খুঁজছি। আমি ভাবতে পারছি না যে আমার পুত্রবধূর জন্য মিনির চেয়ে ভাল মেয়ে খুঁজে পাব।

মেহতাজী বন্ধুকে জড়িয়ে ধরে দাবি-দাওয়া সম্পর্কে জানাতে চাইলে শঙ্করান বললেন, 'তুমি তো জানোই আমি যৌতুক বিরোধী। সুলক্ষণা ও সুচরিত্রের অধিকারিণী একটা মেয়েই খুঁজছি। আমি আমার সন্তান-সন্ততিদের সুখ-শান্তির জন্য প্রচুর অর্থ উপার্জন করি।'

প্রথমবারের মত জগদীশ মেহতা তার বাল্যবন্ধুর দিকে অন্তরঙ্গ দৃষ্টিতে তাকালেন।

মেহতাজী বুঝলেন শঙ্করান পিল্লাই তার সবচেয়ে বড় বন্ধু, তাছাড়া সে দুটো সাবান ফ্যাক্টরির মালিক হিসেবে সবার কাছে সুপরিচিত। মেহতাজীর মনে স্বস্তি ফিরে এল। তিনি দ্রুত গাড়ি চালিয়ে বাড়ি পৌঁছে তার পুনর্জাত কন্যাকে সুখবরটা দেওয়ার জন্য উদগ্রীব হয়ে উঠলেন।

অনুবাদ মনোজিৎকুমার দাস

লেখক পরিচিতি

১৮৯৯ সালের ২৭ মার্চ কেরালার তিরুবনন্তপুরমে জন্মগ্রহণকারিণী লক্ষ্মী মেনন ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামী, রাজনীতিবিদ এবং সুলেখক। তাঁর পিতার নাম রাম বর্মা থাম্পান এবং মাতা মাধবীকুট্টি আম্মা। ১৯৩০ সালে অধ্যাপক ভি কে নন্দন মেননের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। অধ্যাপক মেনন ত্রিবাংকুর ও পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ছিলেন। একদা তিনি ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ পাবলিক অ্যাডমিনিট্রেশনের পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। লক্ষ্মী মেনন ১৯৫২ থেকে ১৯৬৬ সাল পর্যন্ত রাজ্যসভার সদস্য ছিলেন। তিনি বিভিন্ন মেয়াদে প্রতিমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৬৭ সালে রাজনীতি থেকে অবসর গ্রহণের পর তিনি সমাজসেবা ও লেখালেখির সঙ্গে সম্পৃক্ত হন। তাঁর লেখা বইগুলোর মধ্যে *সুইট এন্ড সাওয়ার*, *অ্যানগে মালা*, *বিগ ব্রাদার আন্ধ্র* উল্লেখযোগ্য। ভারতীয় মহিলাদের উন্নয়নে নিবেদিতপ্রাণ লক্ষ্মী মেনন ১৯৫২ সালে পদ্মভূষণ পুরস্কার লাভ করেন। ইংরেজি ভাষায় লেখা *রিবর্ণ ডটার* গল্পটি 'পুনর্জাত কন্যা' নামে এখানে পত্রস্থ হল। ১৯৯৪ সালের ৩০ নভেম্বর তিনি শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

সৌহার্দ

ভারতে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি

ভারত সরকার প্রত্যেক বছরে ভারতীয় কারিগরি ও অর্থনৈতিক সহযোগিতা (ইন্ডিয়া টেকনিক্যাল এন্ড ইকোনমিক কো-অপারেশন-আইটিইসি) কর্মসূচির আওতায় প্রশিক্ষণ কোর্সের প্রস্তাব দিচ্ছে। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের ৫০টি স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠানে এসব স্বল্পমেয়াদী কোর্সের মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন ধরনের বিষয় যেমন– একাউন্টিং, টেলিযোগাযোগ, ইংরেজি, ব্যবস্থাপনা, গ্রামোন্নয়ন ও অন্যান্য বিশেষায়িত কারিগরি কোর্স। ভারত সরকার ৩-৬ মাসের সংক্ষিপ্ত ও মাঝারি মেয়াদি এসব কোর্সের ব্যয়ভার বহন করে।

যোগ্যতা

আবেদনকারীর বয়স ২৫-৪৫ বছরের মধ্যে হবে এবং সরকারি-বেসরকারি বিশেষায়িত কোর্সের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কাজে ৫ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। সরকারি প্রতিষ্ঠান, বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ, স্বনামধন্য কর্পোরেট হাউস বা বাণিজ্যিক সংস্থায় কর্মরত ব্যক্তিবর্গ এ কোর্সে প্রশিক্ষণ নিতে পারবেন। ইংরেজির ব্যবহারিক জ্ঞান অত্যাবশ্যক।

কিভাবে আবেদন করবেন

আইটিইসি-র যে-কোন কোর্সে আবেদন করতে হলে আবেদনকারীকে আইটিইসি-র https://itecgoi.in পোর্টালে গিয়ে নিজস্ব লগইন ও পাসওয়ার্ড তৈরি করে নিজেদের নাম রেজিস্টার করতে হবে। তারপর অনলাইনে মনোনীত কোর্সে আবেদন করতে হবে। আবেদনপত্র জমা দেওয়ার পর আবেদনকারী ফরম ডাউনলোড করে আবেদনপত্রটি হাইকমিশন অফ ইন্ডিয়া, ঢাকা-য় ফরওয়ার্ড করবেন।

সরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত ব্যক্তিকে অর্থমন্ত্রণালয়ের অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ বা পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুপারিশসহ আবেদনপত্র পাঠাতে হবে। কোর্সের বিস্তারিত বিবরণ এবং আবেদনপত্র নিম্নলিখিত লিঙ্ক থেকে পাওয়া যাবে:- http://itec.mea.gov.in লিঙ্কগুলো ভারতীয় হাই কমিশনের ওয়েবসাইট www.hcidhaka.gov.in-এর Education & Training সেকশনেও পাওয়া যাচ্ছে। যে কোন তথ্যের জন্য যোগাযোগ করতে পারেন: fshoc@hcidhaka.gov.in এবং commerce@hcidhaka.gov.in

Training Programme in India

The Government of India offers the training courses under the India Technical and Economic Cooperation (ITEC) programme every year. The courses include diverse subjects such as Accounting, Telecommunication, English, Management, Rural Development and other specialized technical courses in over 50 reputed Institutions across India. These are short and medium term courses of between 3-6 months duration and are completely sponsored by the Government of India.

Eligibility

The applicants must be between 25-45 years of age and should have 5 yearsÕ relevant work experience in the area of specialized course in either Government or in a private organisation. They may belong to Government, Universities, reputed corporate houses or trade bodies. Working knowledge of English is essential.

How to apply

To apply for any ITEC course, the applicant must visit ITEC portal at https://itecgoi.in and register himself/herself by creating their own login and password. Thereafter, apply for the selected course online. After submitting the application form, the selected course online. After submitting the application form, the applicant should download the form and forward the application to the High Commission of India, Dhaka along with a letter of recommendation from the parent organisation of the applicant. Applicants working in the Government must approach the Economic Relations Division (ERD), Ministry of Finance or the Ministry of Foreign Affairs of the Government of Bangladesh for recommending the applications.

The details of courses on offer for the year and application forms can be downloaded at the following links :-

http://itec.mea.gov.in

The links are also available at the website of the High Commission of India at www.hcidhaka.gov.in under the Education & Training section.

Any queries may be addressed to fshoc@hcidhaka.gov.in & commerce@hcidhaka.gov.in

> রাধারমণের গানের কেন্দ্রীয় ভাব হচ্ছে অধ্যাত্মচেতনা। মালসী, শাক্ত, বৈষ্ণব, বাউল, দেহতত্ত্ব, সহজিয়া ভাব-সম্মিলন– এসব ধারা লক্ষ্য করা গেলেও রাধারমণের সংগীতের কেন্দ্রীয় প্রেরণা সহজিয়া দর্শন।

প্রবন্ধ

রাধারমণ

জীবনদর্শন ও সংগীতসাধনা

বিশ্বজিৎ ঘোষ

উনিশ শতকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ লোককবি রাধারমণ দত্ত পুরকায়স্থ (১৮৩৩-১৯১৬)রাধারমণ নামেই সমধিক পরিচিত। পারিবারিকসূত্রে শৈশবেই রাধারমণ সহিত্য-অর্ণবে অবগাহন করার সুযোগ পেয়েছিলেন। তাঁর পিতা রাধামাধব দত্তও ছিলেন কবি– যিনি *ভ্রমরগীতা*, *ভারতসাবিত্রী*, *পদ্মপুরাণ*, *সূর্যব্রত পাঁচালি* প্রভৃতি কাব্যের রচয়িতা। জয়দেবের *গীতগোবিন্দ* কাব্যের বাংলা কাব্যানুবাদে রাধামাধব বিশেষ নৈপুণ্যের পরিচয় দেন। শৈশবেই পিতৃহারা রাধারমণ পিতার কাব্যগ্রন্থ পাঠ করে ধর্মের প্রতি অনুরাগী হয়ে ওঠেন। ধর্ম-প্রচারকদের বাণী পাঠ, ধর্মীয় আচার অনুশীলন আর অন্তস্থ অনুধ্যান রাধারমণকে ধর্মচেতনায় প্রণোদনা দান করে। এক সময় তিনি ঘরের বাইরে চলে যান, বৈষ্ণবসাধক রঘুনাথ ভট্টাচার্যের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং আচ্ছন্ন অবস্থায় একের পর এক গান রচনা করেন আর ভক্ত-শিষ্যরা সে-সব গান শুনে শুনে গাইতে থাকেন। এভাবেই রাধারমণ হয়ে ওঠেন অসামান্য এক লোককবি। প্রসঙ্গত স্মরণ করা যায় দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফের এই কথা, 'যিনি সিলেটের আকাশ-বাতাস বাউল গানের সুরের দ্বারা আকুলিত ও ব্যাকুলিত করেছিলেন, তিনি রাধারমণ বৈ আর কেহই নন।'

সহজিয়া চেতনায় বৈষ্ণব পদরচনার মধ্য দিয়ে রাধারমণ মূলত সন্ধান করেছেন সত্য ও ঈশ্বরকে। তবে তাঁর সত্যানুসন্ধান বাসনায় কেবল অধ্যাত্মচেতনাই নয়, একইসঙ্গে সেখানে ক্রিয়াশীল ছিল পৃথিবীর মানুষের মুক্তির আকাঙ্ক্ষা। মানুষকে তিনি বড় করে দেখেছেন, গেয়েছেন মানুষের জয়গান।

রাধারমণ রচনা করেছেন এমন গানের সংখ্যা দু'হাজার বলে গবেষকরা উল্লেখ করেছেন। হয়তো আরো কিছু গান লোকমুখে সিলেট অঞ্চলে এখনো প্রচলিত আছে। এসব গান সংগ্রহ করে প্রকাশিত হলে আমাদের লোকসংস্কৃতির ভাণ্ডার নিঃসন্দেহে ঋদ্ধ হবে। নানা বিষয় নিয়ে রাধারমণ গান রচনা করেছেন। তবে অধ্যাত্মচেতনাই তাঁর গানের কেন্দ্রীয় ভাব। অধ্যাত্মবোধের পাশাপাশি রাধারমণের গানে প্রেম, প্রকৃতি, মানবসম্পর্ক, মহাপ্রাণ ভাবনা– এসব বিষয়ও শিল্পিত হয়েছে।

ব্যক্ত হয়েছে যে, রাধারমণের গানের কেন্দ্রীয় ভাব হচ্ছে অধ্যাত্মচেতনা। মালসী, শাক্ত, বৈষ্ণব, বাউল, দেহতত্ত্ব, সহজিয়া ভাব-সম্মিলন– এসব ধারা লক্ষ্য করা গেলেও রাধারমণের সংগীতের কেন্দ্রীয় প্রেরণা সহজিয়া দর্শন। তাঁর গানে অনায়াসে একাকার হয়ে গেছে লৌকিক আর অলৌকিক, অলৌকিকে লৌকিক। কখনো তিনি আখ্যায়িত হয়েছেন বাউল কবি, কখনো বৈষ্ণব কবি– কখনো-বা রসিক কবি। যে নামেই তাঁকে আখ্যায়িত করা হোক না কেন, তাঁর মূল পরিচয় তিনি বাংলার লোকায়ত জীবনের কবি– লোককবি। মানসিক সুখ-দুঃখ, প্রেম-বিরহ-মিলন, ঈশ্বর বিশ্বাস– এইসব প্রসঙ্গ নিয়ে রাধারমণ আমাদের লোকজীবনের সঙ্গে একাত্ম হয়ে আছেন। সাধারণ এবং প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতাই রাধারমণের ভুবনদৃষ্টি ও ঈশ্বরভাবনা বিমণ্ডিত হয়ে রূপান্তরিত হয় গভীর জীবনদর্শন ও প্রগাঢ় ঈশ্বরানুভূতিতে। পাঠক, স্মরণ করুন রাধারমণের অসামান্য এই পদ:

ভব নদীর ঢেউ দেখিয়া
দাঁড়াইয়া রহিয়াছে কূলে
দয়াল গুরু পার কর
হীন হীন কাংগালে।
দিছো খেওয়া ভবের হাটে
আপন হস্তে মারছো বৈঠে
পার করি দাও নিচ কপটে অবহেলাতে।
আমার মন হইয়াছে বেদিশা
ঠিক করে হাল ধরবো নারে।

সহজিয়া বৈষ্ণব দর্শনই রাধারমণের দিব্যদর্শনের প্রধান ভিত্তি। বাউল ও দেহাত্মবাদী দর্শনের প্রভাব থাকলেও শেষ পর্যন্ত এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হতে হয় যে, তিনি ছিলেন একজন সহজিয়া বৈষ্ণব। প্রসঙ্গত উদ্ধৃত করা যায় রাধারমণ গবেষক চৌধুরী গোলাম আকবরের এই অভিমত: ব্যক্তিগত জীবনাচরণে সংগীতচর্চায় গুরু রঘুনাথের চিন্তাসূত্রে প্রভাবান্বিত এবং একনিষ্ঠ ছিলেন [রাধারমণ]। ফলে, তিনি ধর্মমতে সনাতন হিন্দু হলেও আধ্যাত্মিকতায় ছিলেন সহজিয়া বৈষ্ণব। রাধারমণের জীবনার্থের মূল উৎস, প্রকৃত প্রস্তাবে, সহজিয়া বৈষ্ণবধর্ম। এ কারণেই, বোধকরি, ভক্ত-শিষ্যদের সামনে তন্দ্রালু অবস্থায় উচ্চারণ করেছেন একের পর এক রাধা-কৃষ্ণবিষয়ক পদ। রাধাই তাঁর কবিপ্রতিভাকে উদ্দীপ্ত করে পৌনঃপুনিকভাবে, রাধার বিরহই তাঁর কাছে ধরা দেয় মানবাত্মার চিরায়ত বিরহ হয়ে। স্মরণ করা যাক রাধারমণ রচিত জনপ্রিয় এই গানটি:

ভ্রমর কইও গিয়া
শ্রীকৃষ্ণ বিচ্ছেদের অনলে
অঙ্গ যায় জ্বলিয়ারে ॥
ভ্রমররে...
কইও কইও কইওরে ভ্রমর কৃষ্ণরে বুঝাইয়া
মুই রাধা মইরা যাইমু কৃষ্ণহারা হইয়ারে ॥

রাধার বেদনা কবি রাধারমণের কাছে ধরা দিয়েছে মানব-মানবীর শাশ্বত বিরহ হয়ে। তাই রাধা যখন বলে– 'দেহপ্রাণ আঁখি কান্দে/ প্রাণবন্দের লাগিয়া বিন্দে গো/ বিন্দে শ্যাম দেও আনিয়া; তখন রাধারমণ দার্শনিকতায় উপনীত হন এই বোধে– 'ভাইবে রাধারমণ বলে গো/ দুঃখ জনম ভরিয়া/ কুল গেল কলঙ্ক রইল/ জগৎ জুরিয়া গো।' রাধার এই বিরহকে রাধারমণ মানবজীবনের পরম সম্পদ বলে বিবেচনা করেছেন। তাই অন্তিমে বিচ্ছেদ থাকলেও কবি মানুষকে আহ্বান করছেন রাধাভুবনে, কেন-না তিনি জানেন বিচ্ছেদ-বিরহ-বেদনাই মানুষকে করে তোলে শুদ্ধ ও পবিত্র। তাই তিনি ভক্তদের আহ্বান করেন এইভাবে:

প্রেম বিলাতে যাবে যদি মন
রাধারানীর কল গাড়িতে
ত্বরায় কর আরোহণ ॥
শমনের ভয় রবে নারে
পাবে নিত্য ধন ॥

সহজিয়া চেতনায় বৈষ্ণব পদরচনার মধ্য দিয়ে রাধারমণ মূলত সন্ধান করেছেন সত্য ও ঈশ্বরকে। তবে তাঁর সত্যানুসন্ধান বাসনায় কেবল অধ্যাত্মচেতনাই নয়, একইসঙ্গে সেখানে ক্রিয়াশীল ছিল পৃথিবীর মানুষের মুক্তির আকাঙ্ক্ষা। মানুষকে তিনি বড় করে দেখেছেন, গেয়েছেন মানুষের জয়গান। মানবচেতনায় উজ্জীবিত ছিল তাঁর কবিমন। তাই হিংসা, বিদ্বেষ, হানাহানিতে লিপ্ত মানুষকে তিনি সত্যের পথে মুক্তির পথে আহ্বান জানিয়েছেন। রাধারমণ বিশ্বাস করেন, রিপুর তাড়না থেকে মুক্ত হতে পারলেই মানুষ মুক্তির সাধনায় সিদ্ধি লাভ করতে পারবে। জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে সকল মানুষকে তিনি আহ্বান করেছেন এই মুক্তির মিছিলে। সামাজিক সাম্যচেতনায় উদ্দীপ্ত ছিল রাধারমণের মন, তাই বৈষ্ণবীয় আধ্যাত্মিকতায় নিমগ্ন থেকেও অবলীলায় তিনি উচ্চারণ করেন এই মানবচেতনা:

এমন দয়াল আইল ঘরে ঘরে প্রেম বিলাইল না করিল জাতের বিচার।

রাধা-কৃষ্ণের পদরচনা সূত্রে রাধারমণের সঙ্গীতে রূপায়িত হয়েছে তাঁর স্বকীয় প্রেমচেতনা। প্রেমের অধরা মাধুরী সন্ধান করেছেন রাধারমণ। প্রেমের জন্য সবকিছু বিসর্জন করতে রাজি তিনি। তাই শত অপবাদ আর গঞ্জনার মুখেও তাঁর প্রেমিকা নারী অকুণ্ঠিত চিত্তে উচ্চারণ করে এইকথা: প্রেম জ্বালায় প্রাণ যায়/ হাঁটিয়া যাইতে পাড়ার লোকে/ কতই মন্দ গাইয়া যায়/ লোকের নিন্দন পুষ্প চন্দন/ অলংকার পইরাছি গায়। রাধা-কৃষ্ণবিষয়ক পদে কখনো কখনো আধ্যাত্মিকতা ছাড়িয়ে মর্ত্যের প্রেমিক-প্রেমিকারা উপস্থিত হয়েছে রাধারমণের পদে। প্রসঙ্গত কৃষ্ণচরিত্র স্মরণ করা যায়। রাধাকে পাবার জন্য কৃষ্ণের আকুতি বাউল কবির রচনায় লৌকিকতায় রূপ পেয়েছে:

জন্মের মত দিয়া ফাঁকি উড়ে গেল রাধাপাখি
সুবলরে– কলসী লইয়া কাঁখে আড় নয়নে ঘোমটা টেনে
জল আনতে যায় বিধুমুখী,
আসার আশে আর কতদিন পন্থপানে চেয়ে থাকি।

রাধার জন্য কৃষ্ণের এই আকুলতায় আমাদের লোকায়ত জীবনই যেন চিত্রিত হয়েছে– কৃষ্ণকে মনে হয় সে যেন বাঙালি ঘরেরই কোন প্রেমিক যুবক। প্রসঙ্গত উদ্ধৃত করা যায় সমালোচকের এই ভাষ্য:

সিলেট অঞ্চলে ধামাইল গান খুবই জনপ্রিয়। এ ধারার গানে মানবাত্মার সুপ্ত বিরহবোধই প্রধানত শিল্পিত হয়। রাধারমণ দত্ত অনেক ধামাইল গান রচনা করেছেন। রাধার বিরহ কবির কাছে মানবাত্মার শাশ্বত বিরহ হয়ে প্রতিভাত হয়েছে। এ কারণে তিনি ধামাইল গানে পৌনঃপুনিকভাবে রাধা-বিরহের ছবি এঁকেছেন।

'...মধ্যযুগের পদাবলি সাহিত্যের উত্তরসাধক রাধারমণ দত্তের পদে আমরা এক রক্তমাংসের লোহিত কৃষ্ণকে প্রত্যক্ষ করি। শুধু তাই নয়; প্রেমিক যুবক কৃষ্ণ রাধা-বিরহে কাতর আবার রাধার অভিমান দূর করার জন্যে তার নানারকম ফন্দি পাঠক-শ্রোতার বিস্ময় উদ্রেক করে। এ দৃষ্টিকোণ থেকে রাধারমণ দত্তের গানে যে কৃষ্ণকে আমরা অবলোকন করি সে কৃষ্ণ আমাদের লোকায়ত সমাজের একজন প্রতিনিধি, গ্রামীণ জনপদে বিচরণকারী এক দুরন্ত যুবক– প্রেমিক যুবক।

রাধারমণের অধ্যাত্মসাধনায় গুরু-নির্ভরতার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয়। তিনি বিশ্বাস করেন, গুরু-শিষ্যের যুগল সাধনার মাধ্যমেই মানবজীবনে আসতে পারে আকাঙ্ক্ষিত মুক্তি। রাধারমণ লিখেছেন– 'গুরুর বাড়ি ফুল বাগিচা/ শিষ্যের বাড়ি কলি/ গুরু দিলা মহামন্ত্র যুগে যুগে তুরি, গুরু।' শিষ্যকে ভাল করে বুঝতে হবে গুরুর উপদেশ, তা না হলে আসবে না আকাঙ্ক্ষিত মুক্তি। জীবন থেকে মহাজীবনের পথে উত্তরণের আকাঙ্ক্ষায় সর্বদা আত্মমগ্ন রাধারমণ। তাই গুরুর রূপকে তিনি খুঁজে নিতে চেয়েছেন মুক্তির পথ। সাধক কবির চেতনায় গুরুই এক সময় রূপান্তরিত হল মহাপ্রাণ সত্তায়– শান্তি ও সিদ্ধিলাভের বাসনায় কবি কামনা করেন মহাপ্রাণ সত্তার আধ্যাত্মিক মিলনের। নিচের গানটি এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে অনুধাবনযোগ্য:

জুড়াতে প্রাণের জ্বালা
ডাকি তোমায় মহাপ্রাণে
প্রাণের ব্যথা প্রাণ পথে ডাকি
শুনো নাকি মহাপ্রাণ।
প্রাণের কথা প্রাণে প্রাণে
বুঝে কি সে আর প্রাণ বিনে?
তাই সে আমি প্রাণের সনে
মিশাতে চাই আমার প্রাণ।
শ্রী রাধারমণের গান
শুনো নাকি মহাপ্রাণ
প্রাণে করে আনচান
কেমনে জুড়াই প্রাণ।

গভীর পর্যবেক্ষণে, একথা বলা যায় বোধ করি, রাধারমণ কল্পিত 'মহাপ্রাণ'-ভাবনার সঙ্গে মিল আছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'মহামানব'-এর। রবীন্দ্রনাথের মহামানব ও মানব আর ঈশ্বরের এক যুগপৎ অনুভব।

রাধারমণ মানবমুক্তিতে বিশ্বাসী থেকে একের পর এক গান বেঁধেছেন। সাময়িক সুখে মানুষ ভুলে যায় পরমসত্তাকে, কামকেলি অর্থ-বিত্তকে সে মনে করে পরম প্রাপ্তি। এ ধরনের মানুষকে সৎপথে মুক্তির পথে নিয়ে আসতে চেয়েছেন রাধারমণ। লোকায়ত ভাষায় বিপথগামী মানুষকে তিনি আহ্বান করেছেন মুক্তির সাধনায় মানুষকে সতর্ক করেছেন ব্যঞ্জনাময় এই ভাষায়:

মাগীর দেহে মগ্ন হইয়া
মূল নাম বিস্মরিয়া
দিন কাটাইলাম চাইয়া চাইয়া
বৃথারে সংসারের লাগি।

দিন গেল কামকেলিতে
মাল নিল ছয় ডাকাইতে
দিশা পাই না লেখাইতে
দারোগার কুদানের লাগি

ভাইবে রাধারমণ বলে
দিন গেলরে মায়ার ছলে
খেয়াঘাটে ঠেকবে কলে
ভেকের বৈরাগী।

আধুনিক নগরসভ্যতা বিবিধ উপাচারে বিপথগামী করে মানুষকে, ঈশ্বরসাধনার পথ থেকে মানুষকে নিয়ে যায় ভোগের জগতে। রাধারমণ সচেতনভাবে রঙিন নগরসভ্যতা থেকে মানুষকে নিয়ে যেতে চেয়েছেন নিভৃত কোন লোকালয়ে। কেন-না, তিনি বিশ্বাস করেন নিভৃতি আর নির্জনতা ছাড়া পরমসত্তার অস্তিত্ব উপলব্ধি করা যায় না। এ কারণেই বোধ করি বৈষ্ণব সাধক রঘুনাথ ভট্টাচার্যের সান্নিধ্যে এসে তিনি পেয়ে যান সাধনার পথ-উৎস– বাড়ির পাশের নলুয়া হাওরে আশ্রম নির্মাণ করে সেখানেই ধ্যানমগ্ন হলেন। রঙিন নগরজীবন থেকে তিনি তাঁর ভক্ত-শিষ্যদের আহ্বান করেছেন নিভৃত ধ্যানলোকে:

ঢাকার শহর রং বাজারে রঙের বেচাকেনা
মদনগঞ্জের মাজন মোরা ঐ ঘাটে যাইও নারে
ভাইবে রাধারমণ বলে এই পারে বসিয়া রে
তুমি সকলেরে তরাইলায় গুরু আমার দিন যে
গেল বইয়া রে।

সিলেট অঞ্চলে ধামাইল গান খুবই জনপ্রিয়। এ ধারার গানে মানবাত্মার সুপ্ত বিরহবোধই প্রধানত শিল্পিত হয়। রাধারমণ দত্ত অনেক ধামাইল গান রচনা করেছেন। রাধার বিরহ কবির কাছে মানবাত্মার শাশ্বত বিরহ হয়ে প্রতিভাত হয়েছে। এ কারণে তিনি তাঁর ধামাইল গানে পৌনঃপুনিকভাবে রাধা-বিরহের ছবি এঁকেছেন। এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা যায় রাধারমণের অতি জনপ্রিয় এই ধামাইল গান– 'মনো করি রাই রংগিনী/ আর যমুনায় যাইও না/ কালোরূপ লাগিলে অংগে/ হেমাংগি আর রবে না/ ভাইবে রাধারমন বলে/ ছাড়া বিষম যন্ত্রণা/ প্রেমের আঠা বিষম লেঠা/ ছাড়াইলে তো ছাড়ে না।'

রাধারমণের গানের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য, প্রায় সকল পদের শেষেই তিনি সচেতনভাবে ভনিতা ব্যবহার করেছেন। 'কহে' 'বলে', 'ভনে'– এসব শব্দের ব্যবহার থাকলেও তিনি প্রধানত ভাইবে রাধারমণ বলে ভনিতাই ব্যাপকভাবে ব্যবহার করেছেন। ভাইবে রাধারমণ বলে এই শব্দগুচ্ছ প্রকাশ করে তিনি যা বলেছেন তাতেই প্রকাশিত তাঁর গভীর জীবনদর্শনের নানা সূত্র। রাধারমণের ভনিতাসমূহ গভীর দার্শনকতায় সিদ্ধ, জগৎ এবং জীবন সম্পর্কে ফকির ভূয়োদর্শনের নির্যাস– ওগুলো যেন মন্ত্রের মধ্যে বীজমন্ত্র। রাধারমণের পদ থেকে এমন কয়েকটি ভনিতা নিচে উপস্থাপিত হল:

ক. কথা ছিল সঙ্গে নিবো সঙ্গে আমার নাহি নিলো গো
রাধারমণ ভবে রইল জিতে মরা হইয়া।
খ. ভাইবে রাধারমণ বলে মনেতে ভাবিয়া
পরা কি আপনার হয় পিরিতের লাগিয়া।
গ. ভাইবে রাধারমণ বলে নদীর কূলে বইয়া

রাধারমণের গান আমাদের করে তোলে মৃত্তিকামুখী, জীবনমুখী, পরমসত্তামুখী। তাঁর গানের মানবতাবাদী দর্শন এবং ইহজাগতিক চেতনা আমাদের আকৃষ্ট করে, উদ্বুদ্ধ করে– সহযোগ বিস্তার করে নিজেকে চিনতে। জাগতিক হতাশা ব্যর্থতা বেদনায় রাধারমণের গানের পাঠক-শ্রোতা খুঁজে পান পরম নির্ভরের আশ্রয় ও আশ্বাস।

পারৈমু পারৈমু করি দিন ত গেল গইয়া।

ঘ. ভাইবে রাধারমণ বলে দিন গেলরে অকারণ
মিছা মায়ার দিন কাটাইয়া মরণকালে বিড়ম্বন।

রাধারমণের পদাবলিকে কোন অভিধায় আখ্যায়িত করা যায়? গীতিকবিতা, না কি অধ্যাত্মসংগীত– বস্তুনিষ্ঠ না কি ভাবনিষ্ঠ, রূপ তন্ময় না কি প্রাণ তন্ময় কবিতা? বস্তুনিষ্ঠ বা রূপ তন্ময় কবিতায় শিল্প বা শিল্প বিষয়ের সঙ্গে শিল্পীর দূরত্ব অক্ষুণ্ন থাকে। পক্ষান্তরে ভাবনিষ্ঠ বা প্রাণ-তন্ময় কবিতায় শিল্প ও শিল্পী একাত্ম হয়ে যান– শিল্প বিষয় এখানে বিশেষ থেকে নির্বিশেষে বিস্তার লাভ করে। রাধারমণ দ্বিতীয় ধারার কবি। রাধা ও কৃষ্ণের পারস্পরিক রূপানুরাগ, কৃষ্ণের বাঁশির সুরে রাধার মুগ্ধতা, রাধাকে কাছে পাবার জন্য কৃষ্ণের ব্যাকুলতা, রাধা-বিরহের দশ দশা, আক্ষেপের মর্মযাতনা কেবল রাধার বা কৃষ্ণের নয়, কবি রাধারমণেরও। রাধা, কৃষ্ণ আর রাধারমণ এখানে একাত্ম হয়ে যায়– বিশেষ পরিণত হয় নির্বিশেষে। পাঠক, লক্ষ্য করুন নিচের পদ, যেখানে কৃষ্ণই হয়ে ওঠে রাধারমণ ('রাধারমণ' শব্দের অর্থও তাই বটে), বৃন্দাবনের কৃষ্ণের মর্মযাতনায় শোনা যায় সিলেটের কবি রাধারমণের আর্তি ও আকুতি:

আমি রাধা ছাড়া কেমনে থাকি একারে সুবল সখা
ব্রজেশ্বরী রাইকিশোরী একবার এনে দেখা ॥
রাধার কথা মনে পড়লে বুক ভেসে যায় নয়ন জলে
রাধা ছাড়া গোচারণে কেমনে থাকি একা ॥
রাধা আমার প্রেমের গুরু মনবাঞ্ছা কল্পতরু
রাধা আমার হস্তের বাঁশি বলে মানব জনম যায় বিফলে
রাধা ছাড়া গোচারণে ঘুরি একা একা ॥

এখানে ভনিতায় কৃষ্ণের মনোবেদনারই প্রতিধ্বনি করছেন রাধারমণ– কৃষ্ণের বেদনা কেবল কৃষ্ণেরই থাকেনি, তা রাধারমণেরও। একইভাবে রাধাও থাকেনি বৃন্দাবনের 'ব্রজেশ্বরী রাইকিশোরী' তার অবয়বেই ভেসে ওঠে সকল কবি-শিল্পী বা প্রেমিকের কোন এক ব্যক্তিগত একান্ত অধরামাধুরী নারীর প্রতিমূর্তি। এই যে বিশেষ থেকে নির্বিশেষে উত্তরণ, কবির এই যে স্বতন্ত্র ভাবকল্পনা– সে সূত্রে রাধারমণের পদ সীমিত অর্থে, গীতিকবিতা বলাই যায়।

আধুনিক কাব্যবিচারে রাধারমণের গানে নানামাত্রিক সীমাবদ্ধতা লক্ষ্য করা যাবে। তবু গভীর আবেগের প্রাবল্য এবং বিশ্বাসের গভীরতা-সূত্রে তাঁর রচিত পদগুলো শেষ বিচারে উত্তীর্ণ হয়ে যায় বলেই বিবেচনা করি। তাঁর পদ শ্রোতা-পাঠকের শিল্পবোধে ছড়ায় সুরের ইন্দ্রজাল। প্রাণস্পর্শী আবেগে আর সুরের মায়ায় তাঁর গান বিস্তার করে এক মোহন অনুরাগ:

ক.
কত দিনে ওরে শ্যাম আর কত দিনে
কত দিনে হইব দেখা বংশী বাঁকা ঐ বনে ॥
বাঁশি দেও সঙ্গে নেও যাও নিজ স্থানে
দূরে গেলে ঐ দাসীরে রাখবে কি তোর মনে ॥

খ.
ও বাঁশিরে শ্যামচান্দের বাঁশি, বাঁশি করিলায় উদাসী
অষ্ট আঙ্গুল বাঁশের বাঁশি তরল বাঁশের আগা
কে তোরে শিখাইল বাঁশি আমার নামটি রাধা।

রাধারমণের গান ভাবপ্রধান-শিল্প-সৌন্দর্য়ের পরিবর্তে সেখানে ভাবের গভীরতা উপলব্ধিই মূল কথা। তবে ভাবকে ভাষায় প্রকাশ করতে গিয়ে সহজাত কাব্যপ্রেরণায় রাধারমণ কাব্যনির্মাণের অনেক বৈশিষ্ট্য তাঁর গানে নিয়ে এসেছেন। দৃন্দসহায় তাঁর সতর্কতা চোখে পড়ার মত, অলঙ্কার নির্মাণেও তিনি রেখেছেন প্রতিভার স্বাক্ষর। রাধারমণের গান থেকে কয়েকটি অলঙ্কার এখানে উদ্ধারণীয়:

ক. অনুপ্রাস
মধুর মধুর অতি সুমধুর মোহন মুরলী বাজে।

খ. যমক
দয়ালরে দয়াল বলে সয়াল সংসার
দয়ালের না থাকলে দয়া দয়াল নাম অসার।

গ. উপমা
জানিয়ে সুহৃদ বাড়াইলে রিদ
না জানি পুরুষ ধারা।
পাষাণ সমান পুরুষ কঠিন
অবলা পড়িল মারা ॥

ঘ. উৎপ্রেক্ষা
তরুমূলে শ্যামরূপ হেরিলাম তরুমূলে।
নবীন মেঘেতে যেন সৌদামিনী জ্বলে।

ঔপনিবেশিক সাহিত্যরুচি আপন সংস্কৃতি থেকে পদে পদে আমাদের বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে। ঔপনিবেশিক শক্তি আমাদের এইকথা জোর করে শিখিয়েছে যে, তাদের সবকিছু ভাল আর আমাদের সবকিছু খারাপ। সাদা-কালো প্রভু-দাসের অমোচনীয় যুগ্ম-বৈপরীত্য (binary-opposition) নিজের অনেককিছুর মত লোক সংস্কৃতিকেও এক সময় বাঁকা চোখে দেখতে উদ্বুদ্ধ করেছিল। সে-ধারণার এখন পরিবর্তন ঘটছে। এখন ঐতিহ্য অনুসন্ধানের প্রাচ্য-অভিযাত্রার দিন। এ প্রেক্ষাপটেই বাংলাদেশের লোকসংগীতের দিকে আমাদের তাকাতে হবে। আমাদের লোককবিরা উপনিবেশের শেখানো ভাষায় কবিতা বা গান রচনা করেননি, রচনা করেননি রাধারমণও। রাধারমণের গান আমাদের করে তোলে মৃত্তিকামুখী, জীবনমুখী, পরমসত্তামুখী। তাঁর গানের মানবতাবাদী দর্শন এবং ইহজাগতিক চেতনা আমাদের আকৃষ্ট করে, উদ্বুদ্ধ করে– সহযোগ বিস্তার করে নিজেকে চিনতে। জাগতিক হতাশা ব্যর্থতা বেদনায় রাধারমণের গানের পাঠক-শ্রোতা খুঁজে পান পরম নির্ভরের আশ্রয় ও আশ্বাস। অন্তর্ধানের এত বছর পরেও তাঁর গান যে আমাদের প্রবলভাবে আকর্ষণ করে এখানেই গীতিকার হিসেবে রাধারমণের কালোত্তীর্ণ সার্থকতা।

বিশ্বজিৎ ঘোষ শিক্ষাবিদ, প্রাবন্ধিক

ছোটগল্প

হৃদয়বৃত্তান্ত

রফিকুর রশীদ

শুরুটা ছিল তার পাতার বাঁশি দিয়ে।

আমি তো খুব কাছে থেকে দেখেছি তাকে, বলতে গেলে তার সব পরিবর্তনই ঘটেছে আমার চোখের সামনে, ফলে তাকে অবিশ্বাস করার মত কিছুই খুঁজে পাইনি আমি। সেই ছোটবেলা থেকে বাঁশি বাজাতে দেখেছি। স্রেফ পাতার বাঁশি। গাছের পাতা জড়িয়ে ভাঁজ করে বিশেষ কৌশলে হাতের মুঠোয় পুরে গাল ফুলিয়ে ফুঁ দিলেই বেজে ওঠে– পোঁ... পোঁ...। বেজে ওঠে মানে সবার হাতেই বেজে উঠবে! অসম্ভব! আমি গোপনে এবং প্রকাশ্যে কতভাবে চেষ্টা করেছি, পারিনি। রাগে দুঃখে বাঁশির পাতা দুমড়ে মুচড়ে একাকার করেছি। নুরু হেসেছে। আমার দুর্দশা দেখে তার নাকি হাসি পায়। সে হাসে।

পাতার বাঁশি বাজানোর কালে বেশ দু'চারটি ইতর প্রাণীর কণ্ঠ নকল করে নুরু সবাইকে চমকে দেয়। গরুর হাম্বা, কুকুরের ঘেউ ঘেউ কিংবা বেড়ালের মিউ মিউ ধ্বনি সবাই শোনে, কিন্তু ওই প্রাণীগুলো কি সব সময় একই রকম অনুভূতি প্রকাশ করে, নাকি একই কথা বলে!

আবার সবার চোখের অগোচরে আমার কাঁধে হাত রেখে কত সহজে প্রস্তাব রাখে– চলো যাই কাজলাপাড়ে, বাঁশি ধরা শিখিয়ে দেব।

কাজলা আমাদের বাড়ির পাশের নদী। নামেই শুধু নদী। সেই কবে নদী চরিত্র হারিয়ে বৃদ্ধা নারীর মত বুক চিতিয়ে শুয়ে আছে নির্বিকার। তবু আমরা সেই নদীপাড়ে পুটুশ বনে যাই দিনের আলোয় কিংবা জোছনা রাতে। নুরু আমাকে পাখির ডিম পেড়ে দেয়, ফড়িং কিংবা প্রজাপতি ধরে দেয়, তাই বলে বাঁশি বাজানোও শেখাবে! বয়সে দু'এক বছরের বড় হলেও সে আমার জোতদার পিতার একপাল গরু চরানো রাখাল বই তো নয়! সেই রেস্তা ধরে আমাকে মিয়াভাই ডাকে, কখনো বা নাম ধরেও ডাকে, কিন্তু সেটা বাড়ির বড়দের সামনে কিছুতেই নয়। প্রভু-ভৃত্যের এমন মাখামাখি কেই-বা পছন্দ করে। আগত্যা বড়দের চোখ ফাঁকি দিয়েই আমরা কাজলপাড়ে যাই, পাতার বাঁশি বাজানোর কৌশল শেখার চেষ্টা করি।

সে সব কৌশলের কিছুই আমার শেখা হয়নি। কিন্তু আমার বিস্ময়বিমুগ্ধ চোখের সামনে নুরু ঠিকই পাতার বাঁশি বাজায়, পল্লীগীতি-ভাওয়াইয়া গানের সুর তোলে; অবাক কাণ্ড হচ্ছে এক সময় আর বাঁশিও লাগে না তার, শুধু হাতের মুঠোয় মুখের ফুঁ দিয়েই বাঁশির মত বাজিয়ে শোনায়। কিছুদিন পর দেখা গেল গানের সুর শুধু নয়, সে আব্দুল আলীম নীনা হামিদ ফেরদৌসী বেগমের কণ্ঠ নকল করে তাদের বিখ্যাত গানগুলো দিব্যি গেয়ে শোনাচ্ছে। হুবহু সেই কণ্ঠ, সেই সুর। নারী-পুরুষ কণ্ঠ দুইই সে নকল করতে পারে। একদিন আব্দুল জব্বারের বিখ্যাত গান 'তুমি কি দেখেছ কভু জীবনের পরাজয়'ও নামিয়ে দিল। এসব দেখেশুনে কোন মানুষের চোখ কপালে না উঠে পারে!

পাতার বাঁশি বাজানোর কালে বেশ দু'চারটি ইতর প্রাণীর কণ্ঠ নকল করে নুরু সবাইকে চমকে দেয়। গরুর হাম্বা, কুকুরের ঘেউ ঘেউ কিংবা বেড়ালের মিউ মিউ ধ্বনি সবাই শোনে, কিন্তু ওই প্রাণীগুলো কি সব সময় একই রকম অনুভূতি প্রকাশ করে, নাকি একই কথা বলে! ক্রোধে উন্মত্ত কুকুর শত্রুকে তাড়া করার সময় যে ধ্বনি উচ্চারণ করে, স্নেহে বিগলিত কুকুরমাতা সন্তানকে স্তন্যদানের সময় নিশ্চয় সেই একই ধ্বনি উচ্চারণ করে না। হোক ইতর প্রাণী, তবু তাদের ভিন্ন ভিন্ন অনুভূতির মধ্যে পার্থক্যটুকুও সনাক্ত করে নুরু এবং তা হুবহু নকল করে শোনায়। কেউ চ্যালেঞ্জ করলে কখনো কখনো সে প্রমাণ করেও দেখায়। ঠিক চ্যালেঞ্জ নয়, আমার মা একবারে আবদেরে গলায় নুরুকে বলে– ঘুঘুপাখি কি বিরান হয়ি গেল হা বাপ! গলায় গয়না-আঁকা ঘুঘু দেখিনি কদ্দিন!

তা বটে, মাঠে যথেচ্চ পরিমাণ কীটনাশক ছিটানোর ফলে ঘুঘুসহ নানা পাখপাখালি বিরান হবার পথে। আমাদের উঠোনে কিংবা ঝাঁকড়া গাছের ডালে পাখিদের আনাগোনা একেবারে কমে গেছে। নুরু একগাল হেসে বলল, ঘুঘু দ্যাখ্‌পেন নাকি ঘুঘুর ফাঁদ দ্যাখপেন চাচি-মা?

ফাঁদ আর কী দেখব! তুই আমাকে ঘুঘু দ্যাখা দিনি!

ব্যাস্। হাতের মুঠোয় বাঁকা ঠোঁট লাগিয়ে ঘুঘুর কণ্ঠে ডেকে ওঠে নুরু। আশেপাশে ছড়িয়ে থাকা ঘুঘু পাখি এসে উঠোন ভরে যায়। রান্না ঘর থেকে চাউল এনে তাদের খেতে দেয় মা। ঘুঘুরা খুশিতে ডেকে ওঠে, ঘুঘুর ঘু...।

নুরুর এসব কাণ্ডকীর্তি দেখে কে না অবাক হয়! আমরা ছেলে ছোকরার দল তো তার পেছনে লেগেই থাকি, নানাভাবে উত্যক্ত করি। দিনের শেষে হাঁস-মুরগির ঘরে ফেরার সময় তখনো হয়তো হয়নি, অথচ আমরা আবদার করে বসি– নুরু মিয়া, দেখাও তোমার কেরামতি, হাঁস-মুরগি ডাকো দেখি!

নুরুর মুখে হাসির বিভা! বড়ই রহস্যময় সে হাসি।

আমরা অপরিসীম কৌতূহলে তাকিয়ে থাকি তার মুখের দিকে সে ঋষিবৎ ঔদাসীন্যে জানায়,

মাথা খারাপ! অবলা পশুপাখিকে জ্বালাতন কত্তি হয় না।

জবাব শুনে আমরা অবাক। আমার মা এগিয়ে এসে বলে,

জ্বালাতন কিসির বাপ! উরা কি খাঁচায় ওঠ্‌পে না?

এখনো বেলা ডুবিনি যে চাচি-মা!

তা হোক। তুমি ডাকো। আমি চাড্ডি খাতি দিই। তারপর তো খাঁচায় ওঠ্‌পে!

অগত্যা নুরুকে রাজি হতেই হয়। হাতের মুঠোয় মুখ ঠেকিয়ে নানান রকম ধ্বনি তোলে। হাঁসের ডাক। মুরগির ডাক। নকল, তবু কত অবিকল। বিভ্রান্ত হাঁস-মুরগির ডাক শুনে ছুটে চলে আসে উঠোনে। থমকে দাঁড়ায়। এদিক ওদিক কী যেন খোঁজে। আমার মা ওদের ভাষা বুঝেই হোক আর না বুঝেই হোক, দ্রুত হাতে চাউলের খুদ ছিটিয়ে দেয়, ধানের কুঁড়ো মাখিয়ে দেয় পরম মমতায়। তারপর আবার নুরুর সামনে দাঁড়িয়ে শুধায়,

সোলেমান নবীর নাম জানো তো নুরু?

নুরু ভীষণ লজ্জা পায়। ঘাড়মাথা চুলকিয়ে নিতিবিতি করে বলে, কি যে বলেন চাচিমা! কুথায় নবী পয়গম্বরের কতা! অপবিত্র মুখি তাদের নাম নিয়া চলে! হঠাৎ দাঁতের ফাঁকে জিভ কাটে নুরু, ওই নাম করলি আমি গুনাগার হয়ি যাব মা।

এই ঘটনার পর থেকে আমার মায়ের আচরণে একটু একটু পরিবর্তন চোখে পড়ে। আশৈশব সে শুনে এসেছে সোলোমান নবীর কুদরতি ক্ষমতার কথা– তিনি নাকি পশুপাখির ভাষা বুঝতেন; এখন নিজ বাড়ির রাখালের মধ্যে সেই অলৌকিক গুণের স্ফূরণ ঘটতে দেখে তো চমকে ওঠারই কথা! সেই সঙ্গে তার মনে পড়ে যায়, কোন ধর্মসভায় নাকি কার কাছে যেন শুনেছিল– যুগে যুগে নবী পরগম্বর-অবতারদের অনেকেই নাকি রাখাল রূপে এসেছেন এই পৃথিবীতে; সেই কেচ্ছা মনে পড়তেই আমাদের অতিচেনা নুরুর দিকে সমীহভরা চোখে তাকায়, আবার অতি সংগোপনে আমাকে নুরুর সঙ্গে মিশতে নিষেধও করে।

যদ্দূর মনে পড়ে, এ জীবনে মায়ের নিষেধ মান্য করার চেয়ে অমান্য করাতেই অধিক আনন্দ পেয়েছি। এ ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। তাছাড়া কোন অপরাধের জন্য নুরুর সঙ্গ আমাকে পরিহার করতে হবে সেটাই তো আমার স্পষ্ট নয়, অকারণে একটা আদেশ জারি করলেই হল! নুরু কি আমাকে গরু চরানোর প্ররোচনা দেয়। বরং লেখাপড়া করতে না পারার জন্য সে দুঃখ করে, আমাকে অনুপ্রেরণা দেয়, আমার বইয়ের পাতা উল্টিয়ে ছবি দেখে, অতি শৈশবের বর্ণ পরিচয় ঝালিয়ে নেয়ার চেষ্টা করে, শক্ত শব্দের বানান ভেঙে ভেঙে শিখিয়ে দিলে খুশি হয়; নুরুকে তো আমার ভালই লাগে। তাকে আমি ত্যাগ করব কোন দোষে!

সত্যি কথা বলতে কি, বেশ কয়েক বছর পর এই নুরুই আমাদের সবাইকে ত্যাগ করে কোথায় যেন উধাও হয়ে যায়। আমি তখন ইউনিভার্সিটির ছাত্র। নুরুও ঢের বড় হয়েছে। আমাদের বাড়ির বাঁধা মাইনের রাখাল-কৃষাণ আর নয়। কী জানি কোন অদৃশ্য শর্তে আমার জোতদার বাবা মাঠঘাট দেখাশোনার সম্পূর্ণ দায়িত্ব তার উপরে ছেড়ে দিয়েছে। দিনে দিনে সে প্রায় বাড়ির ছেলের মর্যাদা অর্জন করেছে। অচিরেই সেই ছেলের বিয়ে থা দিয়ে সংসারী করার ভাবনাও আমার মা

ভাবছে বলে শুনতে পাই। এইখানে এসে তার প্রবল আপত্তি।

কেন, আপত্তি কিসের?

ততদিনে আমাদের নুরুর নামডাক চারদিকে বেশ ছড়িয়ে পড়েছে 'নকল-নুরু' হিসেবে। যে-কোন কণ্ঠস্বর চমৎকারভাবে নকল করতে পারে এবং নকল কণ্ঠে বিখ্যাত শিল্পীর গান গেয়ে শোনাতে পারে বলেই মানুষের মুখে মুখে তার এই নামকরণ হয়ে যায়। খ্যাতির সঙ্গে বেশ স্বীকৃতিও আসতে শুরু করে। একবার ইউনিভার্সিটি থেকেই খবর পেলাম– আমাদের নুরু নাকি কোন এক সার্কাস পার্টিতে ভিড়ে গেছে, তার ওই নকল কণ্ঠস্বর শোনানোর জন্য ভাল মাইনে দেবে। মাকে বলে গেছে শীতের দু'মাস কাটিয়ে সে আবার ফিরে আসবে। আমি ভাবি, ফিরে এলেই হয়, আমাদের ভার্সিটির অডিটোরিয়ামে তার একটা শো করাব। আমার মুখে সে অনেক গল্প শুনেছে ভার্সিটির, কত কিছু নিয়ে যে কৌতূহল তার সীমা-পরিসীমা নেই, সেই নুরু একবার বৃহৎ পরিমণ্ডলে বেড়িয়ে গেলে নিশ্চয় খুব খুশি হবে। আমার বন্ধু মহলে নুরুর বিষয়ে বিস্তর আলোচনা হয়, তাকে নিয়ে একটা শো করানোর বিষয়ে সবাই একমত। এখন সে এলেই হয়।

আমার মায়ের অনুযোগের ধারা থেকে টের পাই, নুরু শিগগিরই বিয়ে করবে না। সার্কাসদলের ছুকরিদের সঙ্গে ঢলাঢলি করলে কি তার চরিত্রের ঠিক থাকে! তার আবার বিয়ে-থার কী দরকার!

নুরুর প্রতি অপত্যস্নেহের আধিক্যবশত মায়ের এই অনুযোগ, সে কথা সহজেই বোঝা যায়। অথচ নুরু ঠিক একদিন সার্কাসদল থেকে বাড়ি ফিরে আসে। এখানে আসা ছাড়া জগতসংসারে নিরাপদে এবং নিরুদ্বেগে দাঁড়াবার আর কোন জায়গা নেই। পিতৃমাতৃহীন অনাথ শৈশব থেকে এই বাড়িকেই তার ঠিকানা বলে জেনেছে। দু'মাসের জন্য সার্কাস দলে গিয়ে তার চোখমুখ বেশ খুলেছে, প্যান্টশার্ট জুতো মোজা পরে বেশ ফুলবাবুর মত ভাব হয়েছে, তাই বলে আপন ঠিকানা ভুলে যাবে সে! সার্কাস ফেরত নকল নুরুকে দেখতে আসে অনেক লোক। উঠানের মাঝখানে দাঁড়িয়ে নতুন শেখা সেই সব ক্রীড়া-কসরৎ দেখিয়ে অতি সহজেই সে সবার চোখে মুখে তাক লাগিয়ে দেয়। আর খইফোটা উনুনের মত তার মুখে কথার ফুলঝুরি তো ফুটতেই থাকে। উঁচু গলায় ঘোষণা দিয়ে সবাইকে জানিয়ে দেয়– অল্পদিনেই সে ইন্ডিয়া চলে যাবে।

ইন্ডিয়া! ইন্ডিয়া কেন?

বেশ গুরুগম্ভীর চালে ঘাড় মাথা ঝাঁকায়। গোঁপের আড়ালে হাসে। তারপর বলে, মক্কা না গেলি হজ্ব করা হয়!

এমন ঘোরপ্যাঁচের কথার মাথামুণ্ডু অনেকেই বুঝতে পারে না। তারা পুরনো অভ্যাসমাফিক নকল নুরুর কাছে দাবি জানায় ইতর প্রাণির নকল কণ্ঠস্বর শোনার। কেউ-বা সার্কসের বাঘের গর্জন শুনতে চায়। সবাইকে অবাক করে আমার চাচাতো বোন আয়েশা হঠাৎ আবদার জানায়– পাতার বাঁশি বাজাও না নুরু ভাই!

যে মেয়ে মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়ে বসে আছে, রেজাল্ট বেরুলেই তিন মাইল দূরের কলেজে ভর্তি হবে, তার কেন বাঁশির সুর শোনার আহ্লাদ! নকল নুরু সবার সব দাবি পূরণ করে অম্লান বদনে, আয়েশার বেলায় এসে জানায় সে আর বাঁশি বাজাবে না, তবে গান শোনাবে। হেমন্তের গান। হেমন্ত মুখার্জির গলা নকল করে সে গাইতে শুরু করে– 'যে বাঁশি ভেঙে গেছে তারে কেন গাইতে বলো...।'

যার জন্য নুরুর এই গান গাওয়া সেই আয়েশা গান শেষ হবার আগেই সহসা ফুঁপিয়ে ওঠে এবং আমার মায়ের কাছে গিয়ে নালিশ জানায়, এ গান আমার ভাল লাগছে না বড় মা। অন্য গান গাইতে বল। মেয়ের কথা অবাক হয়ে শোনে আমার মা, কিন্তু নুরুকে সেদিন কিছুই বলে না। আরো দু'তিন দিন পর রাতের খাবার সামনে বেড়ে মা জিজ্ঞেস করে, হা বাপ নুরু, তুই ইন্ডিয়া যাবি কেন?

জবাব না দিয়ে ভাত খেতে থাকে নুরু। বেশ কয়েক গ্রাস খাবার পর নুরু বলে, ইন্ডিয়ায় গুরু আছে যে!

কিসের গুরু?

আমি যে সব জিনিস নকল করে শোনাই দেখাই, এসব আরো ভাল কইরি শিখতি হলি গুরু ধরতি হবে।

চমকে ওঠে আমার মা। দীর্ঘশ্বাস চেপে বলে,

ওসব আর শিখতি হবে না। তুই আমার কাছেই থাক।

খাঁচায় আটকে পড়া পাখির মত ডানা ঝাপটায় নুরু, আমি তালি মিয়াভাইয়ের কাছে যাব।

আচ্ছা তাই যাস। সে আসুক আগে।

মিয়াভাই কবে বাড়ি আসবে চাচি-মা?

সামনে তার পরীক্ষা। পরীক্ষার আগে তো একবার আসবেই।

আচ্ছা আসুক।

সেদিন মুখে আসুক বললেও নুরু প্রকৃতপক্ষে আমার জন্য অপেক্ষা করেনি। অবশ্য কবুল করাই ভাল, পরীক্ষার আগে আমারও বাড়ি আসা হয়ে ওঠেনি। এসেছি পরীক্ষার পরপরই। ততদিন আমাদের নকল নুরু

বাংলাদেশ-ভারত
মৈত্রী সমিতি

হোমটাউন প্রজেক্ট, লেভেল # ১৬, সুট # ১৫বি
৮৭ নিউ ইস্কাটন, ঢাকা-১০০০
E-mail: info@bifs.org.bd, b_ifs@yahoo.com
(জিপিও বক্স # ৭৭৫)
ওয়েবসাইট: www.bifs.org.bd

ABSSI
Association of Bangladeshi Students Studied in India

ভারতে উচ্চশিক্ষা লাভকারী শিক্ষার্থী সমিতি
President: Dr. Dalem Chandra Barman
VC, ASA University, Dhaka
Phone: 01552 334300
Secretary: Shamim Al-Mamun
Phone: 01715 902146

শখের বশে ক'দিন ভিড়েছিলাম সার্কাস পার্টিতে। সেইখানে আমার কলাকৌশল দেখে কুমারখালির এক সাংবাদিক শুভেন্দু বিশ্বাসের সন্ধান দেন। দু'হাত কপালে তুলে বলে, আমার গুরুদেব তো মানুষ নন, দেবতা। তিনি সব উজাড় করে দিতে চান। কিন্তু আমি যে মূর্খ! আমি সে সব নেব কী করে? নেবার মত পাত্র আছে আমার?

সবার অলক্ষে নিরুদ্দেশ যাত্রা করেছে। আমার সরল মা তবু বিশ্বাস করে বসে অছে, নুরু হয়তো আমার কাছেই গেছে। আমার জন্য ক'দিন নাকি খুব ছটফট করছিল সে। তা হবেও হয়তো-বা। অন্তরের সেই ছটফটানি থেকে সে আমাকে একটা চিঠি লিখেছিল। নুরুর হাতের চিঠি। ব্যাপারটা আমার কাছে যেমন কৌতূহলের, তেমন বিস্ময়ের। সামান্য অক্ষরজ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে প্রয়োজনের সময় মানুষ এভাবে চিঠি লিখতেও পারে! নুরু বাংলা ভাষায় লেখা গদ্য পদ্য বেশ ঝরঝর করে রিডিং পড়তে শিখেছে সে আমি খুব ভাল করে জানি, কলম ধরে লিখতে গেলেই যত গোলমাল। তার হাতের আঁকাবাকা অক্ষর আমার খুব চেনা। বাক্য গঠনও খুবই কাঁচা। পুরো বাক্য পাঠের পর মনে মনে জোড়াতালি দিয়ে তার এক প্রকার অর্থ দাঁড় করে নিতে হয়। বহু সাধ্য সাধনায় আমিও সেই চিঠির মর্মোদ্ধার করি। খুব সাদামাটা কথায় সে জানাতে চেষ্টা করেছে– বাড়ি ছেড়ে না গিয়ে তার কোন উপায় ছিল না। কেন তাকে এমন সিদ্ধান্ত নিতে হচ্ছে সে কথা প্রকাশ করা সম্ভব নয়। তবে তাকে বাড়ি ফিরিয়ে আনার জন্য কেউ যেন খুঁজে খুঁজে হয়রান না হন। এমন কি আমিও যেন চেষ্টা না করি। কখনো সম্ভব হলে সে নাকি নিজে থেকেই বাড়ি ফিরে আসবে। কী একটা যেন-শেষ কথা আমাকে জানাতে চেয়েও পারছে না বলে খুব দুঃখ তার। নুরুর লেখা সেই চিঠি আমি কতবার যে উল্টে পাল্টে পড়েছি তার ইয়ত্তা নেয়। অথচ বহুদিন পর আমার দৃষ্টিতে ধরা পড়ে– খামের উপরের ঠিকানাটুকু সে নিজে হাতে লেখেনি। কেমন যেন মেয়েলি অক্ষর গঠন। অন্য কারো কাছ থেকে লিখিয়ে নিয়েছে। এই অন্যটা যে কে, তা আর আমার খুঁচিয়ে বের করার ইচ্ছা হয়নি। নুরুর জন্য অনেকদিন আমার বুকের ভেতরে যন্ত্রণার বুদ্বুদ উঠেছে, নুরুর নাম ধরে মাকেও কাঁদতে দেখেছি, তবু আমি নুরুকে খুঁজে বের করার চেষ্টা করিনি। এমন কি আমার চাচাতো বোন আয়েশা একদিন ছলোছলো চোখে আমার কাছে জানতে চায়– নুরু ভাই তা হলে তুমার কাছেও যায়নি মিয়াভাই! আমি চোখ তুলে আয়েশার দিকে তাকিয়ে প্রশ্নটি শুনেছি মাত্র, তারপর মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছি, কোন উত্তর দিতে পারিনি।

দুই.

না, লোকে যাকে নকল নুরু বলে, আমাদের সেই নুরুর সঙ্গে আমার আর কখনো দেখা হয়নি। দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে জীবনের ধুলোবালির আস্তরণে ঢাকা পড়ে গেছে তার চিরসবুজ মুখের আদল। অথচ কে জানত– জীবনের মধ্যবেলা পেরিয়ে এসে আমার সেই বাল্যসহচর নুরুকে দেখতে হবে টেলিভিশনের পর্দায়! এখন সে আর নকল নুরু নয়, বিনোদন ম্যাগাজিনের জনপ্রিয় উপস্থাপক তার পরিচয় করিয়ে দিচ্ছেন 'নুরুল ইসলাম হরবোলা' নামে। নাম যা-ই হোক, আমার দু'চোখের পাতা পড়ে না, বেশভূষার আড়ালের মানুষটিকে আমি ঠিকই চিনতে পারি, এ আমাদের হারানো নুরুই বটে। উপস্থাপকের দ্রুতলয়ের প্রশ্নের উত্তরে কেমন টকাস টকাস করে কথা বলছে! চমৎকার উপস্থপনার গুণেই হবে হয়তো, এই ম্যাগাজিন অনুষ্ঠানটি বরাবরই জনপ্রিয়তার শীর্ষে। আমার পক্ষে সব অনুষ্ঠান দেখা হয়ে ওঠে না, তবে মাসের এই বিশেষ দিনটিতে ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে নিয়ে টিভির সামনে বসে আমার স্ত্রী। হরবোলার কাণ্ডকারখানা দেখে আমার ছেলেমেয়েরা হাসিতে গড়িয়ে পড়ে, তাদের মায়ের চোখে বিস্ময়ের স্তব্ধ ছায়া। এ সময় আমাকে দেখে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলে– দ্যাখো দ্যাখো, লোকটার একই মুখে কত রকম ভাষা! আমিও অবাক হওয়ার ভান করি– তাই তো! ভারি আশ্চর্য ব্যাপার!

উপস্থাপক তখন জানতে চাইছেন,

আপনার এ বিদ্যা আপনি শিখলেন কোথায়?

নুরুর কী স্বতস্ফূর্ত জবাব,

প্রকৃতির কাছ থেকে।

বলেন কী! কোন গুরু নেই আপনার?

হ্যাঁ, আছে। অনেক পরে গুরুর সন্ধান পেয়েছি।

কী নাম তার? কোথায় থাকেন?

দু'হাত কপালে ঠেকিয়ে পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে গুরুর নাম উচ্চারণ করে,

শ্রী শুভেন্দু বিশ্বাস। জন্ম তার এই বাংলাদেশেই, থাকেন তিনি কলকাতায়।

বাংলাদেশই জন্ম?

হ্যাঁ। কুষ্টিয়া জেলার কুমারখালিতে গড়াই নদীর পাড়ে জন্ম। দেশ ভাগের পর ওপারে চলে যান। কলকাতায় গিয়েই তিনি আসল গুরুদেবের সন্ধান পান।

আসল গুরুদেব! তিনি আবার কে?

শ্রী রবিন ভট্টাচার্য। আমি তাকে দেখেনি। শুনেছি তিনি বোলপুর-শান্তিনিকেতনে নকল গলায় ডেকে ডেকে পাখপাখালিদের বিভ্রান্ত করতেন। স্বয়ং কবিগুরু নাকি কাছে ডেকে তাকে আশীর্বাদ করে বলেছিলেন– হরবোলা। হরেক রকম বোল।

অ। তাহলে এই জন্য আপনার নাম নুরুল ইসলাম হরবোলা?

জ্বি, হরবোলা হচ্ছে কবিগুরুর দেওয়া নাম।

আপনি তাহলে কলকাতায় গিয়ে গুরুর কাছে শিক্ষা নিয়েছেন?

আমি মূর্খ মানুষ, শিক্ষা নেব কী করে? সামান্য গুরুসেবা করেছি মাত্র। আমার গুরু লেখাপড়া জানা মানুষ। হরবোলার কলাকৌশল নিয়ে বই লিখেছেন।

তাই নাকি! বই পড়েও শেখা যাবে এসব!

গুরুদেব তো তাই বলেন। তিনি একটা হরবোলার ইশকুল খুলবেন। সেইখানে আমাকে থাকতে বলেন। মূর্খ মানুষ সেখানে কী করবে বলুন দেখি!

আপনি এই গুরুদেবের সন্ধান পেলেন কেমন করে?

একগাল হাসি ছড়িয়ে নুরু জানায়,

শখের বশে ক'দিন ভিড়েছিলাম সার্কাস পার্টিতে। সেইখানে আমার কলাকৌশল দেখে কুমারখালির এক সাংবাদিক শুভেন্দু বিশ্বাসের সন্ধান দেন। দু'হাত কপালে তুলে বলে, আমার গুরুদেব তো মানুষ নন, দেবতা। তিনি সব উজাড় করে দিতে চান। কিন্তু আমি যে মূর্খ! আমি সে সব নেব কী করে? নেবার মত পাত্র আছে আমার?

উপস্থাপক একটু উত্তেজিত কণ্ঠে বলেন,

বারবার নিজেকে মূর্খ বলছেন কেন? আপনার শৈশব-কৈশোরের কথা বলুন।

অবলীলায় ঘোষণা করে নুরু,

আমি ছিলাম মাঠের রাখাল। লেখাপড়ার সুযোগ আর কোথায় পেলাম? ছিল এক মিয়াভাই, তার কাছেই সামান্য হাতেখড়ি। আমারই দোষে তাকে হারিয়েছি। লেখাপড়া হবে কেমন করে! ওই অক্ষর চিনি বানান করা পর্যন্তই।

এত কথা শুনতে শুনতে আমার দু'চোখ ঝাপসা হয়ে আসে। কণ্ঠ রোধ করে দাঁড়ায় বাষ্পীয় পিণ্ড। বুকের ভেতর থেকে উথলে ওঠে অভিমান– কে

তোর মিয়াভাই? চাচি-মা কিংবা মিয়াভাইকে ভুলে গেলে তোর কি ক্ষতি!

উপস্থাপক এতক্ষণে হঠাৎ ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ থেকে সরে আসেন। জানতে চান, আপনার এই হরবোলা-জীবনের শুরু হয়েছিল কী দিয়ে?

পাতার বাঁশি দিয়ে। বাঁশিতে ফুঁ দিয়ে টের পাই– ইচ্ছে করলে শব্দকে পাল্টে ফেলা যায়।

আজ কি আমরা একটুখানি পাতার বাঁশি বাজানো শুনব?

না। অনেক আগেই বাঁশি ছেড়ে দিয়েছি। অন্য কিছু বলুন।

পশুপাখির বিচিত্র ডাক আমরা শুনেছি আপনার কণ্ঠে, এই ডাক শুনে পশু-পাখি কি কাছে আসে?

একগাল হেসে সে জানায়,

তাহলে স্টুডিওর বাইরে আসুন। ঢাকা শহরের কাকেদের ডেকে আনি।

এর পর সত্যি সত্যি স্টুডিওর বাইরে ধারণ করা দৃশ্য দেখানো হয়। নুরুল ইসলাম হরবোলা মুখের সঙ্গে হাত ঠেকিয়ে কা কা ধ্বনি উচ্চারণ করতেই উড়ে আসে রাজ্যের যত কাক। কর্কশ কা কা রবে কান পাতা দায়। অগত্যা উপস্থাপক অনুরোধ জানান– তাড়ান ওদের তাড়ান।

আবার বিচিত্র ধ্বনিতে নুরু তাড়িয়ে দেয় কাকেদের।

নুরুর কণ্ঠের ধ্বনিতে কী তাৎপর্য পরিস্ফুট হয় কে জানে, কাকেরা আবার কা কা রব তুলে উড়ে যায়, শিলকড়ুইয়ের ডালে বসে দোল খায়, ডাস্টবিনে বসে ঠোঁট ডুবিয়ে দেয় আবর্জনায়।

কাকেদের হামলা থেকে সদ্য উদ্ধার পাওয়া উপস্থাপক পাঞ্জাবির কোনা ঝেড়েঝুড়ে সাফছুতরো হয়ে নুরুল ইসলাম হরবোলার দিকে তাকান, ঠোঁটের কোণে একটুখানি সলজ্জ হাসি ঝুলিয়ে বলেন,

আপনার এই নকল ডাকেরই এমন শক্তি!

হরবোলার তো সবই নকল।

সবই নকল?

হ্যাঁ, এক সময় তো আমাকে সবাই 'নকল নুরু' বলেই ডাকত!

তাই নাকি!

তবে আর বলেছি কী! এই যে আমার মাথার চুল, নকল চুল। চোখ দুটো অপারেশন করানো, মানেই নকল চোখ। মুখের দাঁত, সেও নকল, বাঁধানো দাঁত, মানেই নকল হাসি। আর বুকের মধ্যে হার্ট আছে, সেখানে পেসমেকার বসানো সারা। কাজেই ওই হার্টও নকল। তাহলে আর বাকি থাকল কী!

উপস্থাপকও মোটেই রসিকতায় কম যান না। তিনি এবার সোজা দর্শকের দিকে দু'হাত নেড়ে বলেন– প্রিয় দর্শক, আপনারা নিশ্চয় জানেন হার্ট মানে শুধু হৃৎপিণ্ড নয়, হার্ট মানে হৃদয়ও। আমাদের বিশ্বাস– নুরুল ইসলাম হরবোলার হৃদয়টা নিশ্চয় নকল নয়।

অনুষ্ঠানের যবনিকা টানার প্রস্তুতি নিচ্ছেন উপস্থাপক। জনপ্রিয় ম্যাগাজিন অনুষ্ঠানের পক্ষ থেকে তিনি হরবোলা শিল্পী নুরুল ইসলামের হাতে ফুলের তোড়া তুলে দিয়ে তার দীর্ঘায়ু কামনা করেন; অভিনন্দন জানান। কিন্তু আমাদের নকল নুরু সহসা তখন হৃদয়বৃত্তান্ত মেলে ধরে। কেমন অবলীলায় সে সবাইকে জানিয়ে দেয়– অনেক বছর আগে বর্ষণমুখর এক গ্রামীণ সন্ধ্যায় তার হৃদয় হারিয়ে যায়। সেই হৃদয়টা মোটেই নকল ছিল না, সেটা ছিল টকটকে লাল জবার মত। হৃদয় হারিয়ে নিঃস্ব হবার পর সে দেশ ত্যাগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। কিন্তু দীর্ঘ দিন পর দেশে ফিরে জানতে পেরেছে, যাকে হৃদয় দিয়ে তার এমন ফতুর হওয়া, সেও নাকি নিঃসংশয় হাতে পারেনি– নকল নুরুর হৃদয়টা আসল ছিল কিনা!

ঘড়ির কাঁটা বলে দিচ্ছে অনুষ্ঠানের সময়সীমা একেবারে শেষ প্রান্তে। ফলে সব আয়োজন গুটাতেই হয় উপস্থাপককে। কোথা থেকে এত আস্থা খুঁজে পান তিনিই জানেন, গভীর প্রত্যয়ের সঙ্গে দর্শকদের জানিয়ে দেন– আমরা বিশ্বাস করি, হরবোলা নুরুল ইসলামের সেদিনের হারানো হৃদয়টা ছিল আসল ও অকৃত্রিম হৃদয়। সবাই সুস্থ থাকবেন, ভাল থাকবেন। শুভরাত্রি।

অনুষ্ঠান শেষ হবার আগে ধীরে ধীরে ফেড হয়ে আসে দৃশ্য এবং শব্দ। ঝাপসা হয়ে আসা টিভি পর্দাতেই আমি খুঁজি সেই মুখ, যে আমাদের নকল নুরুর আসল হৃদয়টাকে চিনতে পারেনি। আমি কি চিনি তাকে, সেই নারীকে?

রফিকুর রশীদ
শিক্ষাবিদ, কথাসাহিত্যিক

ঘটনাপঞ্জি ❖ জুলাই

কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়

০১ জুলাই ১৮৮২ ❖ ডা. বিধানচন্দ্র রায়ের জন্ম
০১ জুলাই ১৯৬২ ❖ ডা. বিধানচন্দ্র রায়ের মৃত্যু
০৪ জুলাই ১৯০২ ❖ স্বামী বিবেকানন্দের মৃত্যু বেলুড় মাঠ
০৭ জুলাই ১৯০৫ ❖ প্রবোধকুমার সান্যালের জন্ম
০৮ জুলাই ১৯১৪ ❖ রাজনীতিক জ্যোতি বসুর জন্ম
০৮ জুলাই ২০০৩ ❖ কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যু
০৯ জুলাই ১৯৩৮ ❖ অভিনেতা সঞ্জীবকুমারের জন্ম গুজরাটে
১০ জুলাই ১৯০৯ ❖ কবি বিষ্ণু দে-র জন্ম
১৯ জুলাই ১৮৯৯ ❖ বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (বনফুল)-এর জন্ম
১৯ জুলাই ১৮৬৩ ❖ কবি-গীতিকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের জন্ম
২০ জুলাই ১৯০২ ❖ কবি সুনির্মল বসুর জন্ম
২২ জুলাই ১৮১৪ ❖ প্যারীচাঁদ মিত্রের জন্ম
২২ জুলাই ১৯২৩ ❖ গায়ক মুকেশের জন্ম লুধিয়ানায়
২৪ জুলাই ১৯৮০ ❖ উত্তমকুমারের জন্ম
২৬ জুলাই ১৮৬৫ ❖ রজনীকান্ত সেনের জন্ম পাবনায়
৩১ জুলাই ১৮৮০ ❖ মুন্সী প্রেমচাঁদের জন্ম

ফিরে দেখা

খান চমন-ই-এলাহি

আমি কয়েক বার গান্ধী হয়েছি
আমিও হেঁটেছি স্বপ্ন কিংবা কল্পনায় অহিংস পথে
আমার সাথে মৌলানা আজাদ, আলী, শরৎ বসু
এবং শহিদ সোহরাওয়ার্দীর বহু বার দেখা হয়েছে
আমরা দিল্লি গুজরাট কলকাতা লাহোর লক্ষ্ণৌয়ে মিলিত হয়েছি
চায়ের ধোঁয়ার সাথে স্বাধীনতার রঙিন স্বপ্নরা ভাসত
ব্রিটিশ খেদাবার কী অপূর্ব যুক্তি সব নেতাদের?
সবাই তেজস্বী, ক্ষিপ্র, বাগ্মী আর ভালবাসায় ভারতীয়?
ভারত মানেই মানুষের রাষ্ট্র
তখন ভারত মানেই ব্রিটিশ থেকে স্বাধীন ভারত

হঠাৎ আমিও আর গান্ধী থাকতে পারলাম না
এমনকি শরৎ-সোহরাওয়ার্দীও না
এমনকি কোন বাঙালি পর্যন্ত না
আমি গান্ধীর এক উত্তরসূরি হিসেবে
কিংবা কোন মানুষের দর্শন জ্ঞান নিয়ে দেখলাম
পাকিস্তান প্রজাতন্ত্রের পতাকা উড়ছে, সোহরাওয়ার্দী নেই
খণ্ডিত ভারতের পতাকা উড়ছে, প্রিয় গান্ধীও নেই
কোথায় সোহরাওয়ার্দী? কোথায় গান্ধী? কোথায় নির্লোভ জননেতা?
কোথায় মানুষের মুক্তি? কোথায় স্বাধীনতা?
দাঙ্গাবিক্ষুব্ধ কলকাতার রক্ত গঙ্গার জলে মিশে আগুন
মানুষের মুক্তি হয়ে যায় ধর্মের মুক্তি
মানুষের স্বাধীনতা হয়ে যায় ধর্মের স্বাধীনতা
এবং বিমূর্ত পড়ে থাকে শরৎ বসু
অথচ জালিয়ানওয়ালাবাগ কিংবা নোয়াখালি সে শিক্ষা দেয় না

তবু এই ভারতে গান্ধী হারেন
হেরে যান শেখ মুজিবও একদিন
কখনো যে বাংলা এমন অখণ্ড স্বাধীন ছিল না
সে-ও শেখ মুজিবের আঙুল নির্দেশে স্বাধীন হল
উড়ল পতাকা, ফুটল ফুল, গাইল জয়গান
তারপর পুরনো পথে আবার হাঁটল সময়
এবং থমকে দাঁড়াল বিবেক!

যাও পাখি বোলো তারে

আশিক সালাম

ছায়াসঙ্গী ছিলি তুই– আজ পাশে নেই
নিয়তির পথ খোঁজে ধু-ধু অন্ধগলি
নিরিবিলি লতাগৃহে আমাকে রেখেই
অন্য ঘরে ভিন্ন পাত্রে স্নেহের অঞ্জলি

সোনামুখি সুঁচ দিয়ে তোর হাতে বোনা
ভালবেসে ফুলতোলা সুগন্ধি রুমাল
চিকন আঙুলে তোর চারু চন্দ্রকোনা
'ভুলো না আমায়'– হৃদিগোলাপের লাল

তৃষিতার ব্যাকুলতা সমুদ্র-খোয়াব
বিবাহের সুর ভাঁজে সহসা সানাই
খ্যাপা ধু-ধু খুঁজে মরি মহুয়া-শরাব
'যাও পাখি বোলো তারে'– ডাকছি কানাই

অনেক পাতার ভিড়ে একটি গোলাপ
বিনুনিয়া যত্নে গাঁথা তোর উপহার
'হিয়া লাগি হিয়া কান্দে'– করছি বিলাপ
স্মৃতিগন্ধ অফুরন্ত পকেটে আমার

পাখির গোত্রান্তর

দুলাল সরকার

পাখির গোত্রান্তর হবে– অস্তিত্ব সংকটে পড়ে নদী
উৎসমুখ হারিয়েছে, বৃষ্টির ভালবাসা প্রশ্নবিদ্ধ আজ,
আমার সকল অনুভূতি বৃক্ষ ও নীলিমাকে নিয়ে
মৃত্তিকার প্রতি যত প্রগাঢ় টান– কৃষকও সন্দিগ্ধ
তবে কি সংশয়বিদ্ধ সব আকর্ষণ?
এই প্রশ্নে বিভক্ত গোধূলী– কতটা অবিচ্ছেদ্য মাটি ও কৃষক
এই প্রশ্নে মাটি ও মানুষের মৌলিক পরিচয়ে
উঠেছে কি দ্বিধার দেয়াল?
বাতাসের নির্লিপ্ততা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে বশে আনতে
এখন সে সন্দেহের তালিকায়– সবাই কি প্রিয়?
প্রশ্নবিদ্ধ শস্যক্ষেত, তার উপরে প্রবাহিত বায়ু
কতটা আমার, এ প্রশ্নের অভিঘাতে জর্জরিত আমি;
সংশয়ের যাঁতাকলে পিষ্ট হয়ে সূর্যের কিরণ
নক্ষত্রের বাড়ি– প্রশ্নবিদ্ধ আমার ভবিষ্যৎ
স্মৃতি, সত্তা, কাল গর্ভের নাড়ির টানে কেঁপে ওঠে
পুরনো বটের প্রৌঢ় ঝুরি।

পার্থিব

শ্রীপর্ণা বন্দ্যোপাধ্যায়

তুমি ও তোমার চিঠি নিয়ে ঘর করি
ভবিতব্যকে হাতছানি দিয়ে হাসা
ঘাটেতে রয়েছে সাজানো গোছানো তরী
শখ করে তবু জেলে ডিঙিতেই ভাসা।

ভাবিনি কখনও এত বড় ক্যানভাস
রঙে ভরে গিয়ে উথলে উপচে যাবে
চেনাশোনা সুখে পূর্ণতা নির্যাস
উদ্বায়ী হয়ে ভিক্ষাপাত্র পাবে।

তুমি ও তোমার বেপরোয়া স্বপ্নেরা
জ্যোৎস্নায় ভিজে মশগুল আশ্লেষে
আবাদি জমিকে ফেলে চলে যায় তারা
ভেজা বিছানাও কাঁদছে ভুলের রেশে।

ভেজা চুলে ছিল কিছু দূর সীমারেখা
শরীরের ভাঁজে দুর্বল কাঁটাতার
নাভিমূল বুঝি ছিল কস্তুরী মাখা
আবাহন করে উদ্যত হাতিয়ার।

তুমি রাজি আছ বদলাতে অভিমুখ
কবিতা ভাসাতে উজানের অনুকূলে
সঞ্চয়ে আছে ক্ষণিকের রতিসুখ
আগুনকন্যা থেকে যাবে এলোচুলে।

শ্রীপর্ণা বন্দ্যোপাধ্যায়
ভারতের কবি

পূর্ণিমাজল

আশুতোষ ভৌমিক

চন্দ্রালো ফুটছে চন্দ্রালো
অঙ্গারকালো রাত্তিরের গতরে
ফুটছে নদী ফুটছে ঢেউ
কর্কশ বালুচরে
মরচেপড়া হৃদয়গৃহে মনকাড়া হাসি হাসে
নবজাতকের প্রাণ
খেলার মাঠের মত খেলা করে
বাতাসের বুকে সাম্যের সবুজ ঘ্রাণ
সবিতার ঠোঁটে রোদ্দুর ফোটে
ভোর খোলে জানালা
কৃষ্ণাভ-নিশীথে ইটভাঙা-শব্দের মত
কারা ভাঙে কারা?
রাশি রাশি হাসি নিয়ে প্রহরেরা দ্রুতলয়ে
ছুটে চলে সেইখানে–
যেখানে কালো কালো দুঃখগুলো
সাঁতার খেলে পূর্ণিমাজলে

বৃষ্টিবিরহ

ইন্দ্রাণী দত্ত পান্না

দীঘল মেঘের ঢল
চল আমার বাড়ি চল,
আমার শুষ্ক মরুভূমি
ভালবসতে পারি, তুমি
যদি আজ ভাসিয়ে দাও।

এখন আর কোন মন্ত্রে বৃষ্টি হয় না
ধুলোর ঝড় ওঠে আর ঢেকে যায়
দৃষ্টি, বোধ, আবেগ, স্মৃতি– সব।
চোখের পাতার ওজন অসহ্য হয়।
সমস্ত ডালপালা নাড়িয়ে
প্রবল ঝাঁকুনি দিয়ে, পাগলের মত
গাছটা যা বলে তা শোনার জন্য
পাশে এসে বসে না কোন প্রকৃতি প্রেমিক।
বাকল খসে পড়তে পড়তে
হাড়-পাঁজরা জেগে ওঠে
শিরা ফেটে বেরিয়ে আসে দলাপাকানো দিনরাত;
ঝড় চলতে থাকে আর মেঘ ভরা
বৃষ্টি সরে যায় অন্য পাড়ায়।

একটা বৃষ্টির রাত তোমার আমার।
এ এক কল্পনার সার
মাথার ভেতর রেখে বাঁচা,
ঝড়ে দুলছে নিয়মের খাঁচা
কৃষ্ণনাম আর নয়, পাখিটি ওড়াও।

যে পাখিটি দূর থেকে শিষ দেয়, ও জানে না
ঘৃণাকে কখনও ভালবাসার মলাটে ঢাকতে নেই,
শ্রাবণের দিনে ভেঙে দিতে নেই সাঁকো।
তার ভাঙনের হাত কিছুতেই থামতে চায় না,
ঝড়ের দিকে ঠেলে দেয় নরম কথোপকথনকে,
বৃষ্টি তৈরি করব বলে ভোররাতে কয়েক ফোঁটা অশ্রু জমাই।

অন্য আকাশে মেঘ চলে যায়।
সত্যিই তো কী হবে উপায়?
'আমার জীবন রক্ষা ঘটিল দায়
কে করে জিজ্ঞাসা আর
আমার ভাঙা নাওয়ের ভরসা কী আর।'

[কবিতার শেষ তিনটি পঙ্‌ক্তি 'জালাল শা'র একটা গান থেকে
কৃতজ্ঞতার সঙ্গে নেয়া]

ইন্দ্রাণী দত্ত পান্না
ভারতের কবি

নিবন্ধ

বরষিত বর্ষা

নাসরীন মুস্তাফা

মৌসুমি বায়ু দক্ষিণ এশিয়া এবং ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলের জলবায়ুতে সর্বাপেক্ষা প্রভাব বিস্তারকারী বায়ুপ্রবাহ। গ্রীষ্ম ও শীত মৌসুমে সমুদ্র ও ভূ-পৃষ্ঠের উত্তাপ এবং শীতলতার তারতম্যের ফলে ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মৌসুমি বায়ুপ্রবাহের দিকও পরিবর্তিত হয়। শীত মৌসুমে শুষ্ক মৌসুমি বায়ু উত্তর-পূর্ব দিক (ভূভাগ) থেকে সমুদ্র অভিমুখে প্রবাহিত হয় এবং গ্রীষ্মকালে দক্ষিণ-পশ্চিম (সমুদ্রভাগ) থেকে ভূমি অভিমুখে প্রবাহিত হয়। মৌসুমি বায়ুর ইংরেজি প্রতিশব্দ মনসুন (Monsoon) মূলত আরবি শব্দ মাওসিম (Mawsim) থেকে এসেছে। আরবিতে মাওসিম শব্দের অর্থ কাল বা ঋতু। ধারণা করা হয়, এই মৌসুমি বায়ুচক্রটির সূত্রপাত ঘটে ১ কোটি ২০ লাখ বছর আগে (মধ্য মায়োসিন) হিমালয় পর্বতমালা সৃষ্টির সময় থেকে।

গ্রীষ্মকালে ভারতের পশ্চিমাঞ্চল জুড়ে বিস্তৃত ভূখণ্ডে প্রচণ্ড তাপের কারণে নিম্নচাপ কেন্দ্রের উৎপত্তি হয়, কিন্তু একই সময়ে তুলনামূলকভাবে শীতলতর ভারত মহাসাগরে সৃষ্টি হয় উচ্চচাপ কেন্দ্রের। বায়ুচাপের প্রকৃতিগত ভিন্নতাই উচ্চচাপ অঞ্চল থেকে বায়ুকে নিম্নচাপ অঞ্চলের দিকে প্রবাহিত করে এবং মৌসুমি বায়ু সমুদ্র থেকে ভূমির দিকে প্রবাহিত হয়। বায়ুপ্রবাহের এই ধরনটি গ্রীষ্মকালীন মৌসুমি বায়ু হিসেবে পরিচিত। ভারতীয় উপমহাদেশে গ্রীষ্মকালীন মৌসুমি বায়ু প্রচুর পরিমাণে জলীয় বাষ্প বহন করে আনে। তাই এ অঞ্চলে সে সময় ভারি বৃষ্টিপাত হয়। বিশেষ করে বাংলাদেশ ও ভারতের প্রতিবেশী দেশসমূহে এই বায়ুর প্রভাবে প্রচুর বৃষ্টিপাত ঘটে।

ভারত মহাসাগর অঞ্চলে গ্রীষ্মকালীন মৌসুমি বায়ু দুটি শাখায় বিভক্ত: আরব সাগর এবং বঙ্গোপসাগর প্রবাহ। আরব সাগরের বায়ুপ্রবাহটি ভারতের কেন্দ্রভূমি এবং ভারতীয় উপদ্বীপের আবহাওয়ার প্রকৃতির ওপর অধিক প্রভাব বিস্তার করে।

অন্যদিকে বঙ্গোপসাগরের মৌসুমি বায়ুপ্রবাহটি মূলত বাংলাদেশ, ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চল, গাঙ্গেয় সমভূমি অঞ্চল এবং হিমালয় পর্বতমালার দক্ষিণাংশের পাহাড়ি ঢাল ও পাদদেশীয় অঞ্চলের আবহাওয়ার প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করে। জুন মাসের প্রথম দিকে এই বায়ুপ্রবাহ বাংলাদেশ ভূখণ্ডে প্রবেশ করে এবং ভারতের কেন্দ্র-অঞ্চল জুড়ে অবস্থানরত নিম্নচাপ কেন্দ্রের দিকে প্রবাহিত হতে থাকে।

আষাঢ়-শ্রাবণ এই দুই মাসে বঙ্গোপসাগরের মৌসুমি বায়ুপ্রবাহটি প্রধানত বাংলাদেশ ও সন্নিহিত অঞ্চলে বৃষ্টিপাতের জন্য দায়ী। একেই আমরা বলি বর্ষাকাল। আষাঢ় এসেছে অসাড় থেকে। বৈশাখের রস জ্যৈষ্ঠ মাস হয়ে আরো যখন টইটুম্বুর করে, তখন অবস্থাটা একেবারে অসাড় করে ফেলার মত। জমে থাকা রস অসাড় বা অজ্ঞান করে ফেলে সব, সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যাওয়ার পর সেই রস আকাশকে ফাটিয়ে ঝুমঝুম করে নামে, গাছের পাকা ফল যেমন টুশ করে মাটিতে পড়ে ফেটে যায়। এরপরও থেকে যায় কিছু রস। সে ঝরবে শ্রাবণে। শ্রাব মানে তো রস। বন মানে জঙ্গল। গাছের অনেক উপস্থিতিই তো জঙ্গল বা বন। শ্রাব বা রসের অনেক উপস্থিতি হচ্ছে শ্রাবণ। হরিচরণ বন্দোপাধ্যায় লিখেছেন, 'আষাঢ়ী পৌর্ণ-মাসী যে মাসে', তা-ই আষাঢ়। 'আষাঢ়ানক্ষত্রযুক্ত পৌর্ণমাসী' যে মাসে, সে-ই আষাঢ় মাস। তিনি শ্রাবণ সম্পর্কে লিখেছেন, 'শ্রবণনক্ষত্রে জাত' বা শ্রাবণ মাসটি হচ্ছে 'শ্রবণনক্ষত্রযুক্তা পৌর্ণমাসী'।

বর্ষাকালটা আসলে যে কি, তা আর মুখে বলে বোঝাতে হবে না। কেবলমাত্র কবিগুরুর চোখ দিয়ে দেখলেই চলবে। বাঙালির কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এক চিঠিতে বাংলার বর্ষা ফুটে উঠতে দেখি ভরা পুকুর, আমবাগান, ভিজে কাক আর আষাঢ়ে গল্পের মধ্য দিয়ে। সে কেমন বর্ষা, তার আখ্যান কবিগুরুর কথায় এভাবেই ফুটে উঠেছিল, 'অবশেষে বর্ষা আপনার জালের মধ্যে সমস্ত মাঠ, সমস্ত বন, সমস্ত গ্রাম ঘিরে ফেলেছে; কেবল অবিশ্রান্ত বৃষ্টি... বাঁশঝাড়ে, আমবাগানে, কুঁড়ে ঘরে, নদীর জলে, নৌকোর হালের নিকটে আসীন গুটিসুটি জড়োসড়ো কম্বলমোড়া মাঝির মাথায় অবিশ্রাম ঝরঝর বৃষ্টি পড়ছে।'

বাল্যকালের বর্ষা যৌবনের বসন্তকেও ভিজিয়ে দিতে পারে। শ্রাবণের রাতে বিরহীর কান্না বৃষ্টির সঙ্গে মিশে যায় বলেই তো মনে হয়। কবি নজরুল কী করুণ কণ্ঠে বলেছেন, 'শাওন রাতে যদি...'। আষাঢ়-শ্রাবণের (শাওনের) রাত মন উদাস করে তোলে না যার, সে কি বাঙালি?

বর্ষার ফুল শেফালি আজকাল জ্যৈষ্ঠ মাসে ফুটছে। বর্ষার বিখ্যাত কদম ফুটছে মাঘ মাসে! বেশ ক'বছর ধরেই আষাঢ়-শ্রাবণ মাসের বৃষ্টিময় ঋতুটির চিরাচরিত স্বভাবে পরিবর্তন এসে গেছে। বর্ষার বৃষ্টি জ্যৈষ্ঠ, হেমন্তে বা মাঘ মাসে যতখানি মন দিয়ে ঝরে, আপন ঋতুতে ততটা ঝরতে পারে না কেন, এমন প্রশ্ন উঠতেই পারে বর্ষার রকমসকম দেখে। বর্ষাকালে বৃষ্টি কম হলে বন্যা হওয়ার আশঙ্কা কমে যায়, এ ভাল কথা। কিন্তু ক্ষতি হয় পাটের ফসলে, দুঃখ বাড়ে কৃষকের।

বাংলাদেশের উত্তরে অবস্থিত সুউচ্চ হিমালয় পর্বতমালার বরফগলা পানির প্রবাহ সৃষ্টি করেছে বড় বড় নদীর, যেগুলো উজানের নেপাল ও ভারতের মধ্য হয়ে বাংলাদেশের ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরে গিয়ে পড়েছে। প্রতি বছর গড়ে প্রায় ১০৯৪ বিলিয়ন কিউবিক মিটার পানি বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হত এবং প্রতি বছরই প্রায় ১৫ লক্ষ হেক্টর চাষের জমি বন্যা ও জলাবদ্ধতায় আক্রান্ত হত। মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে এখানে প্রচুর বৃষ্টিপাত হত, যার ফলে বন্যার দেখা মিলত, বন্যা সরে যাওয়ার পর মাটি উর্বরা হত রেখে যাওয়া পলি মাটির কারণে। প্রায় নিয়মিতভাবে হানা দিত ঘূর্ণিঝড়-টর্নেডো-জলোচ্ছ্বাস ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগ। কিন্তু জলবায়ু পরিবর্তনের প্রত্যক্ষ প্রভাবে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় পরিবর্তনটি হচ্ছে এরকম... বৃষ্টিপাত কমছে এবং অসহনীয় তাপমাত্রা বাড়ছে। এর ফলে বাংলাদেশের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে ধানের ফুল আসা থেকে বীজ বের হওয়ার মাঝখানের সময়টুকুতে প্রয়োজনের তুলনায় বৃষ্টিপাত কম হওয়ায় টি-আমন জাতের ধানের উৎপাদন কমে আসছে।

বৃষ্টি কমেছে বলে নদীর পানির প্রবাহ কমে গেছে। ফলে সমুদ্রের পানির বিপুল চাপের কারণে লোনাপানি স্থলভাগের কাছে চলে আসছে। এতে লবণাক্ততা বেড়ে যাচ্ছে জমিতে। দেশের দক্ষিণাঞ্চলে সমুদ্রের লোনাপানি ঢুকে পড়ে পাল্টে দিচ্ছে মাটির গুণগত মান। এই সমস্যা উপকূলীয় অঞ্চল থেকে উত্তর দিকে বিস্তৃত হচ্ছে, আরো উত্তরে বিস্তৃত হতে থাকবে। লবণাক্ততা বৃদ্ধির কারণে সুন্দরবনের সুন্দরী গাছগুলো হুমকির মুখে। আগামরা ও পাতা কংকাল করে ফেলা পোকার আক্রমণের শিকার হয়েছে সুন্দরী এবং সুন্দরবনের আরো অনেক গাছ। সমুদ্রস্তরের উচ্চতাবৃদ্ধি এবং উপকূলে লবণাক্ততা বাড়ায় সূর্যের তাপে তুলনামূলক ঘন লোনাপানি বেশি তাপ শোষণ করে গরম হয়ে ওঠে। সূর্যের অতিবেগুনী রশ্মি বিকিরণের জন্য স্বাভাবিক তাপমাত্রা আরো বেড়ে যায়। ফলে এসব অঞ্চল দিনকে দিন গরম হয়ে উঠছে। বন উজাড় হয়ে গাছ কমে যাওয়ায় আর পানি দীর্ঘক্ষণ তাপ ধরে রাখায় এই গরম আরো লম্বা সময় ধরে পোড়াতে পারে। ফলে অঞ্চলভিত্তিক ঘূর্ণিঝড় বা টর্নেডোর আক্রমণ ঘনিয়ে আসে আচমকা।

ভূগর্ভের পানির স্তর দিনকে দিন নিচে নেমে যাওয়ায় এবং শুষ্ক মৌসুমে গাছপালার প্রস্বেদন বেড়ে যাওয়ায় ভূগর্ভের সুপেয় পানির ভাণ্ডার নিঃশেষিত হচ্ছে। নদীর পানি দিনকে দিন লোনা থেকে লোনাতর হচ্ছে, কম বৃষ্টিপাতের ফলে এর পরিমাণ আরো বেড়ে যায়। তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ হবে সুপেয় পানির জন্য, এ ভবিষদ্বাণী এখন অনেকভাবেই উচ্চারিত হচ্ছে।

মৌসুমি বৃষ্টিপাত না হলে কিংবা অসময়ে খুব বেশি বৃষ্টি হলে মাছের প্রজননে সমস্যা হয়। পানির তাপমাত্রা বেড়ে গেলে পানিতে অক্সিজেনের পরিমাণ কমে যায়, তাতে মাছেদের ডিম পাড়ার শক্তি থাকে না, ক্লান্ত করে ফেলে মা মাছকে। যদিও বা পাড়ে কিছু ডিম, ডিমের আবরণ হয়ে যায় পাতলা। সুস্থ পোনা উৎপাদন সুষ্ঠুভাবে হয় না। মিষ্টি পানির এলাকায় লোনা পানি ঢুকে পড়ছে, এতেও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে মাছেরা। মিষ্টি পানির মাছ কি বাঁচে লোনা পানিতে? হালদা নদীতে রুইজাতীয় মাছ বিপুল উৎসাহে ২,৫০০ থেকে ৩,০০০ কেজি পর্যন্ত ডিম পাড়ত কোন এক সময়, এখন ঠিক সময়ে ঠিক মত বৃষ্টি হয় না দেখে দমে গেছে ওরা, মাত্র কেজি বিশেক হয় টেনেটুনে। ভরা বর্ষায় বৃষ্টি আর বজ্রপাত না পেয়ে সাগর ছেড়ে মেঘনা নদীতে এসে ডিম ছাড়ছে না ইলিশ। হাওর এলাকাগুলো ছিল মাছের বিশাল ভাণ্ডার। সেখানেও হুমকির মুখে মাছের বিভিন্ন প্রজাতি। হাকালুকি হাওড়ের ১০৭ প্রজাতির মাছের মধ্যে ৩২ প্রজাতির মাছই এখন বিলুপ্তির মুখে।

আকাশ থেকে ঝরে পড়া পানির ফোঁটা, যার নাম বৃষ্টি, তার জন্য নিত্য হাহাকার আজ। হাজার বছর ধরে ঝরে পড়া বৃষ্টি পৃথিবীর তাপমাত্রা প্রাণের উপযোগী করতে পেরেছিল বলেই না পৃথিবীতে প্রাণ সৃষ্টি হয়েছিল। এই প্রাণের মধ্যে বৃষ্টির উপকারের প্রতিদান দিতে সবচেয়ে সক্ষম প্রাণটি হচ্ছে গাছ। যে সব এলাকায় গাছ বেশি, সেসব এলাকায় বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বেশি। গাছ তার শরীরের চাহিদার অতিরিক্ত পানি জলীয় বাষ্পের আকারে পাতার উপর অশ্রুবিন্দুর মত সাজিয়ে দেয়। বায়ুমণ্ডলে জমা হওয়া জলীয় বাষ্পের সঙ্গে যোগ হয় এগুলোও, বেড়ে যায় জলীয় বাষ্পের পরিমাণ অর্থাৎ বৃষ্টির পরিমাণ। অতএব, বরষিত বর্ষার প্রার্থনায় নৈবেদ্য হোক গাছ।

নাসরীন মুস্তাফা কথাসাহিত্যিক

ধা রা বা হি ক উ প ন্যা স

পাসিং শো

অমর মিত্র

পাঁচ.

দরজায় বিমল। অতীন জিজ্ঞেস করে, কী হল বিমল?

আমার একটু কথা আছে তোমার সঙ্গে, কথা বলার সময় হবে?

এস এস। বিমলকে আহ্বান করে অতীন। বিমল তার পায়ের টায়ারের চটি বাইরে রেখে কেমন অভিভূতের মত সীমান্তরেখা পার হয়ে ফ্ল্যাটের ডাইনিং কাম ড্রয়িং-এ দাঁড়িয়ে পড়ে। বড় বড় গোদা পা, ফেটে ফেটে নিচের দিকটা বিচিত্র। পায়ে ধুলো লেগে আছে। বিমল অবাক হয়ে সোফাসেট, শোকেস, বুক কেস, পুরনো পুতুল, গণেশ পাইনের পেইন্টিং দেখছে। তারপর বলল, নিলুর কোনও বদল হয়নি, আমারে বলল, ৮৩ নম্বর বাড়িতে খোঁজ নিতে, কিন্তু আমি জানতাম এখেনেই তোমাদের থাকা হত।

ঘুরে এলে ৮৩ নম্বর?

যেতি হয়নি, আরে যার বাবা মরে গেছে, তিন কেলাস নিচে পড়ত, তারে পথে দেখলাম, সকালে তার সঙ্গে বাজারে তুমি কথা বললে না, তারে জিজ্ঞেস করতি সে বলে ৮৩ নম্বর বাড়ি তো তাদের, সে-ই তো আবার এই বাড়ির কথা বলল, নিলু একটা হারামি লোক, জীবনে মানষের ভাল কিছু ভাবে না।

এস, ব্যালকনিতে বসি।

না, আসলে আমার কেমন মনে হল, তোমার সাথে কথা শেষ হয়নি, তোমারে ডেকে নিয়ে পার্কে পুকুর পাড়ে বসে কথা বলব।

কী কথা?

সকালে যেমন হচ্ছিল।

তাহলে? অতীন কী বলবে বুঝে উঠতে পারছে না। শম্পা একটু অবাক। বিমল আসার আগে একরকম ভেবেছিল, এখন ফ্ল্যাটে ঢুকে অতীনের সম্পন্ন আর সুখের জীবনের চিহ্ন দেখে ঘাবড়ে গেছে। তার মনে হচ্ছে আসা ঠিক হয়নি। অতীনের এমন সুন্দর বউ, এমন সুন্দর ঘরগুলি, দেওয়ালের রং, আলোর ছটা, সব তাকে অতিমুগ্ধ করেছে।

অস্বস্তির কারণও হয়েছে তা। সে বলল, না থাক, আমি যাই।

কেন যাবে কেন, এলে যখন বস।

বিমল বলল, নাহ্, তুমি তোমার বউয়ের সঙ্গে গল্প কর, রোববারের বিকেল।

আহা, এস ব্যালকনিতে এস। অতীন ডাকল তাকে। হাওয়াই শার্টের কলার ছেঁড়া, বহু পুরনো, লুঙ্গির চেক উঠে গেছে প্রায়। অতীনের মনে হল, কত শার্ট, প্যান্ট, পাঞ্জাবি, পায়জামা অব্যবহৃত হয়ে তাদের পুরনো কাঠের আলমারিতে পড়ে আছে, বিমলকে দিলে নেবে? নেবে না। আর তা ভালও হবে না। বিমল কি তার অনুগ্রহ নিতে এসেছে? এসেছে মাঠে বসে গল্প করবে, তাই। বিমল তার সমান হয়ে উঠতে এসেছে তার কাছে।

শম্পা বলল, যাবেন কেন, আপনারা বসুন ব্যালকনিতে।

না হয় না, আমি যাই, আমি মাঠে বসি বিকেলে।

চা তো খেয়ে যাবেন?

না চা খাব না, আমি এখন মাঠে গিয়ে রোজকার মত বসব বউদি।

শম্পা বলল, আপনি ব্যালকনিতে গিয়ে বসুন বিমলদা, আপনার কথা ও আমাকে বলেছে, আমি জানি, ব্যালকনিটা অবশ্য মাঠের চেয়ে ছোট, কিন্তু বসে যান, কিছু না খাইয়ে তো ছাড়ব না।

হায়রে বিমল! অভিভূত হয়ে তাকিয়ে আছে অতীনের দিকে। সে তো ভাবতেই পারেনি এমন হতে পারে। ক্লাস ফ্রেন্ডের বউ তাকে এতটা সম্মান দিয়ে ব্যালকনিতে বসতে বলবে। তার কি কোন সম্মান আছে? এক্ষুনি তো নিলু রায় কী সব ভাষায় কী বলে দিল। তাকে তো পুরনো ক্লাস ফ্রেন্ডরা তুই তোকারি করে। চিনতে পারেই না। একজন তো একদিন বলল, উফফ্, সে কি ভাষা! এখানে বসা ঘুচিয়ে দেব শুয়ারের বাচ্চা, এমন এক লাথি দেব না বোকাচোদা, তোর কোন বাপ এসে তোকে বাঁচায় দেখি, আমি কে জানিস তা, আমাকে ঠকাতে গিছিলি।

কী হয়েছিল, না, তার দেওয়া কাঁচা হলুদের ভিতর খারাপ চলে গিয়েছিল কয়েকটি। মোটাসোটা সেই সুজনবাবু, মানে সুজন সাহা তার ক্লাসেই পড়ত। সে নাকি নামকরা ব্যবসায়ী, ধর্মতলায় টিভি-ফ্রিজের বড় দোকান। বউ গায়ে আগুন দিয়ে মরে গেছে। বিমল মাথা নিচু করে শুনেছিল ভদ্দরলোকের খিস্তি। ভয় পাচ্ছিল তাকে না লাথি মারে। এত লোকের ভিতরে কী হবে? না, তা করেনি, লাথি তুলেও সামলে নিয়েছিল। কেউ একটা কথাও বলেনি। চুপ করে শুনেছিল সবাই। ওই সুজনের খুব ক্ষমতা। এমএলএ, কাউন্সিলর থেকে থানার বড়বাবু ছোটবাবু, সবাইয়ের খাতিরের লোক সে। এলাকার বিশিষ্ট লোক হিসেবে এক-দু'বার খবরের কাগজে তার ছবিও বেরিয়েছে। পুজো কমিটির প্রেসিডেন্ট, ক্রিকেট ক্লাবের মাথা। স্বাধীনতা দিবসে ফ্ল্যাগ তোলে, ইন্দিরা গান্ধী, জওহরলাল, মহাত্মা গান্ধীর ছবিতে মালা দেয়। শীতে কম্বল বিতরণে সভাপতি। বিমল একখানি কম্বল পেয়েছিল, বাজারের সব বিক্রেতাকে দেওয়া হয়েছিল। বিমল এখন ব্যালকনিতে, বেতের চেয়ারে। বিকেলে এখন সবদিকে সমাহিত ভাব। রোদ পড়ে গেল একেবারেই। সে বিড়বিড় করে বলল, দ্যাখো অতীন, মাঠে যদি তুমি একা বসে থাক, কিছুতেই নিজেকে একা মনে হবে না।

তাই! অতীন তার এই নিরুপায় ক্লাসফ্রেন্ডকে নতুনভাবে আবিষ্কার করছিল। সে বলছে, অতবড় মাঠ, সন্ধে হয়ে গেল, ছেলেরা বল খেলছিল, তারাও চলে গেল, কিন্তু তোমার একা মনে হবে না, মনে হবে অনেকের সঙ্গে আছ, আকাশে কত তারা।

তুমি ফিল করেছ?

মানে?

অতীন বলে, তোমার মনে হয়েছে?

হয় তো মনে, কিন্তু এই বারান্ডায় যদি দু'জনেও থাকো, তিনজনেও থাকো, মনে হবে একা, বারান্ডা একা করে দেয়।

অতীন জিজ্ঞেস করে, তোমার একা মনে হচ্ছে?

আচ্ছা তুমি যদি রাজার বাড়ি যাও, লাটসায়েবের বাড়ি দেখেছ অতীনভাই?

তুমি দেখেছ?

হ্যাঁ, গেটের বাইরি থেকে, কত জমি গো, কত বড় বাড়ি, রাজার বাড়ি অমনি হয়, সেখেনে কী মনে হতি পারে বল দেখি?

তুমি বল।

বিমল বলল, ভয় করবে, আমার ভয় লেগিছিল।

শম্পা চা নিয়ে আসে। চায়ের সঙ্গে বিস্কুট, মিষ্টি। বিমল বলে, আমি কুনোদিন ভাবিউনি এই বারান্ডায় বয়সে চা খাব, অনেক ভাগ্য। শম্পা বসেছে। বিমল বলল, খুব ভাল দিন আজ, তুমি অমূল্যস্যারের কথা ভুলে গেছ অতীন, সেই যে শাদা ধুতি শাদা পাঞ্জাবি পরতেন।

না, কেন বল দেখি। অতীন জিজ্ঞেস করে।

কিছু না, এমনি বললাম, তোমার মনে আছে প্রশান্তদার কথা?

হ্যাঁ মনে আছে, কেন?

উনি নকশাল হয়ে গেল তাই না?

হ্যাঁ। অতীন অবাক হয়ে দেখছিল বিমলকে। কাঁচা হলুদ থানকুনি পাতা আর এটা ওটা বেচে সব মনে রেখেছে বিমল বিশ্বাস। বলছে, প্রশান্ত মাল স্যার তাকে নাকি ধরেছিল। তাদের দুই ভাইকে দলে টানতে চেয়েছিল। তারা ঠিকই করেছিল স্যারের সঙ্গে চলে যাবে মেদিনীপুর। গ্রামে। তো স্যারই ধরা পড়ে গেল। স্যারের সঙ্গে কথা হত ইস্কুল ছুটির পর। কী সুন্দর মানুষ ছিল লোকটা। মেরেই ফেলেছিল তাকে পুলিশ। ওই নিলুই খবর দিয়েছিল মনে হয় পুলিশকে। নিলু বেঁচে থাকল, কিন্তু প্রশান্ত স্যার বাঁচতে পারল না। আমি বেঁচে থাকলাম দুঃখ-দুর্দশা নিয়ে, কিন্তু তিনি মরে গেলেন। আমি মরে গেলে জগতের কী আর হত বল, কিন্তু প্রশান্ত স্যার বেঁচে থাকলে, কত লোকের জন্য কত কী করতেন তিনি। কী সুন্দর গান গাইতেন তিনি,

অমর মিত্র

অমর মিত্রের জন্ম ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দের ৩০ আগস্ট অধুনা বাংলাদেশের সাতক্ষীরার নিকটবর্তী ধূলিহর গ্রামে। বিজ্ঞানের ছাত্র হলেও পারিবারিক আবহে সাহিত্য তাঁর বিচরণক্ষেত্র হয়ে ওঠে। ২০০৬ সালে *ধ্রুবপুত্র* উপন্যাসের জন্য সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার লাভ করেন অমর। এর আগে, *অশ্বচরিত* উপন্যাসের জন্য ২০০১ সালে পান বঙ্কিম পুরস্কার। অন্যান্য পুরস্কারের মধ্যে রয়েছে, শরৎ পুরস্কার (ভাগলপুর, ২০০৪), সর্বভারতীয় কথা পুরস্কার (১৯৯৮), গজেন্দ্রকুমার মিত্র পুরস্কার (২০১০)। বর্তমানে কলকাতা শহরে বসবাসরত অমর মিত্রের সাহিত্যিক জীবনের সূচনা ১৯৭৪ সালে। প্রথম উপন্যাস *নদীর মানুষ* ১৯৭৮ সালে প্রকাশিত হয় *অমৃত* পত্রিকায়।

হারিয়ে একটি গান *পাসিং শো*-র কেন্দ্রবিন্দু। এই উপন্যাস একটি হারিয়ে যাওয়া গান আর হারিয়ে যাওয়া রেকর্ড নিয়ে। মানুষ তার জীবনে যা হারায় তাই বুঝি ফিরিয়ে আনতে চায় এইভাবে। একটি গান রেকর্ড করে যে গায়ক মুছে গেছেন স্মৃতি থেকে, সেই গান বুঝি ফিরে আসে গভীর রাতে, বাতাসে ভেসে কিংবা স্বপ্নের ভিতরে। আশ্চর্য এই কাহিনি যেন হারিয়ে যাওয়া জীবনেরই অন্বেষণ। আর এক অজ্ঞাতপ্রায় শিল্পীর প্রতিরোধে এই উপন্যাস পেয়েছে অনন্য এক মাত্রা। *পাসিং শো* যেন প্রবহমান জীবনের অফুরন্ত এক প্রদর্শন। *পাসিং শো* কলকাতার বিখ্যাত নাটকের দল *সায়ক* নাট্যরূপ দিয়ে অভিনয় করছে নিয়মিত।

সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কারপ্রাপ্ত অমরের *ধ্রুবপুত্র* খরাপীড়িত প্রাচীন উজ্জয়িনী নগরের কাহিনি– কবি কালিদাসের *মেঘদূত* কাব্যের এক বিপরীত নির্মাণ যেন। দীর্ঘ এই আখ্যান শেষ পর্যন্ত শূদ্র জাতির উত্থান ও কবির প্রত্যাবর্তনে পৌঁছয়।

আর বঙ্কিম পুরস্কারপ্রাপ্ত *অশ্বচরিত* তথাগত বুদ্ধের ঘোড়া কন্থক ও তাঁর সারথী ছন্দকের কাহিনি। লেখক ভারতীয় প্রতিবেশে জাদু বাস্তবতা ব্যবহার করেছেন এই উপন্যাসে। অনন্য ক্লাসিকধর্মী এই উপন্যাস দু'টি বাংলা উপন্যাসে এক আলাদা রীতির জন্ম দিয়েছে।

বিমল একটু অস্বস্তিতে পড়ে স্পষ্ট। সে মাথা নিচু করে বসে থাকে কিছু সময়, তারপর বলে, আসলে এমন তো হয় না, তাই, তবে আমার নিজির ঠিক নেই, ছন্নছাড়া মানুষ আমি, কিছু কথা বলার জন্যিই তো এয়েসি অতীন, এখন তা ভুলি গেসি, এটা ঠিক না, ঠিক আসে আমি থাকলাম, সব একরকম হয় না যে তা বুঝার ক্ষ্যামতা আমার নেই, বিদ্যে তো হয়নি।

মনে আছে তা?

হ্যাঁ, মনে আছে। অতীন বলল।

একটা গান করতেন, বয়ে যায়, সুবর্ণরেখা নদী বয়ে যায়...।

গাইতেন!

হ্যাঁ গো আমি ভুলিনি সেই গান, সুবর্ণরেখা নদী তুমি দেখেছ?

অতীন বলল, হ্যাঁ, খুব বড় নদী।

আছে এখনো?

যাবে কোথায়?

মানুষের মত নদী একেবারে চলে যেতে পারে না?

চমকে ওঠে অতীন, কী বলছ? মানষের মত নদীও যদি চলে যায়, প্রশান্ত স্যার যেমন গেছে। বলতে বলতে বিমল চোখের কোণ মুছে নেয় ছেঁড়া হাওয়াই শার্টের কোণ দিয়ে, বলে, ভাবলিই কান্না পেয়ে যায়, আচ্ছা এমন কি হতে পারে?

অতীন বলল, পারে।

নদী চলে যেতে পারে পশান্ত স্যারের মত?

পারে, কত নদী মুছে গেছে।

কে মুছে দিল জল? জিজ্ঞেস করে বিমল, ভগবান না নিয়তি?

অতীন ঝপ করে বিমলের হাত ধরে ফেলে, বলে, একটা গান বলব, তুমি শুনেছ কি না বলবে, নদী নিয়ে গান, নদীটি গিয়াছে চলিয়া...। শুনতে শুনতে বিমল বিশ্বাস বলল, এই রকমই তো গাইতো পশান্ত স্যার।

না না, এই রকম কেন হবে?

হ্যাঁ এই রকম, বলত সুবর্ণরেখা নদীর গান ছিল তাই, সুবর্ণরেখা বয়ে যায়, চলিয়া যায়, পথ পড়ে থাকে ধুলোয়, তাই তো।

তাই! অভিভূতের মত তাকিয়ে থাকল অতীন।

ছয়.

এ তার বাবার লেখা গান, বাবা কি সুবর্ণরেখা নদীর কথা ভেবে লিখেছিল? তখন সুবর্ণরেখার তীরে বিপ্লব সংগঠিত হয়েছিল। গোপীবল্লভপুর, সিংভূমে বিপ্লবের আগুন ছড়িয়েছিল। বাবা কি গোপনে সেই স্বপ্নের অংশীদার হয়েছিল? অতীন বুঝতে পারে না কী থেকে কী হয়ে যাচ্ছে আজ সমস্তদিন।

বিমল আচমকা ওঠে, যেতি হবে মিতে।

কী বললে গো তুমি বিমল?

বিমল বলল, চা খাওয়া হই গেছে, এবার যাই।

কেন যাবে, এখেনে বস, আমরা কি খারাপ আচরণ করেছি?

বিমল বলে, দ্যাখো মিতে, নিলু রায়ের কথা ধরা যায়, তুমার কথা যায় না।

কী বলছ বুঝতে পারছি না।

বিমল বলে, চিরকাল লাথি খেয়ে এয়েচি, এখন তুমি আলাদা হলে কেমন লাগে, বিশ্বাস হয় আবার হয় না, সন্দেহ জাগে আবার জাগে না।

অতীন বলে, মিতে বললে কেন তাহলে?

বিমল নিজের মনে হাসে, মিতে মিতে মনে হল, তাই।

তবে ওই কথা বলছ কেন?

বিমল বলে, বিশ্বাস হচ্ছে না আমার, আমি মাঠে যাব এখন, কোনদিন বস্তির ভিতরের উঠোনে বসে থাকি একা, কোনদিন মাঠে আসি, কোনও দিন আবার যাই থানকুনি কাঁচা হলুদ, পিঁয়াজ পাতা, রসুন পাতা জোগাড়ে।

অতীন বলল, এখানে তাহলে বসবে না?

বিমল বসে আবার, বলে, আমার ভয় করে যে, বাবা বলত মার খাওয়া ফেমিলি হয় নমোরা।

দিন বদলেছে বিমল, যারা মার খেত তারা উঠে দাঁড়িয়েছে।

হি হি করে হাসে বিমল, বলে, পশান্ত সার বলত তাই, কিন্তু সবটা মন গড়া, গরিব গরিবই থেকে যায়, আমাদের কিছু হয়েসে? তাড়া খেয়ে ওপার থেকে এপার, তারপর থেকে বদল কি কিসু হল?

শম্পা এত সময় ধরে শুনছিল, বলল, উনি যদি না থাকেন, তুমি রাখবে কী করে?

বিমল একটু অস্বস্তিতে পড়ে স্পষ্ট। সে মাথা নিচু করে বসে থাকে কিছু সময়, তারপর বলে, আসলে এমন তো হয় না, তাই, তবে আমার নিজির ঠিক নেই, ছন্নছাড়া মানুষ আমি, কিছু কথা বলার জন্যিই তো এয়েসি অতীন, এখন তা ভুলি গেসি, এটা ঠিক না, ঠিক আসে আমি থাকলাম, সব একরকম হয় না যে তা বুঝার ক্ষ্যামতা আমার নেই, বিদ্যে তো হয়নি।

শম্পা উঠে গেল, আপনারা কথা বলুন, আমি ভিতরে আছি।

তা কেন, আপনি বসুন বৌদি, আমার কথা আর কী, কিসু না।

শম্পা তবুও বসে না। তার মনে হচ্ছিল তার সামনেই বেশি অস্বস্তি হচ্ছে বিমল বিশ্বাসের। শম্পা ভিতরে গিয়ে চুপ করে বসে থাকল। আজ তো অতীনের একটা সভায় যাওয়ার কথা ছিল। সাহিত্য বাসর। অতীন এখনো কবিতা লেখার চেষ্টা করে যায়। গল্পও। হয় কি? ছোট ছোট পত্রিকায় অতীনের লেখা বের হয়। অতীনের ওটা প্যাশন। আজ দুপুরে বেরোবে বেরোবে করেও বেরোল না। ঘুমোয়নি। শুধু সেই কথা, অতুলানন্দ, মীরা বিশ্বাস, বুবাই বিশ্বাস, মীনা মুখার্জি, চন্দ্রাণী মুখার্জি, অনুরোধের আসর– এই সব নিয়ে কাটিয়ে দিল। গুনগুন করতে লাগল। ফিয়েস্তা রেকর্ড পেয়ারটিকে আজ ঢাকা খুলে নেড়েচেড়ে দেখল। তাদের মনে পড়ল, ওটি খারাপ হয়েই ঘরের কোণে আশ্রয় নিয়েছিল। তখন তাদের ঘরে এসেছিল একটি ক্যাসেট প্লেয়ার কাম রেকর্ডার। সেইটি খারাপ হলে অতীনের এক দুঃসম্পর্কের ভাই এসে নিয়ে গিয়েছিল, সারিয়ে ফেরত দেবে বলে, কিন্তু সেটি আর ফেরত আসেনি। ততদিনে সিডি এসে গেছে। ক্যাসেট বাতিল হয়ে যাচ্ছে। একটা সিডি প্লেয়ার কেনা হল তখন। সেটা খারাপ হলে একটা ভিডিও প্লেয়ার। অডিও এবং ভিডিও। সিনেমা দেখা যায় আবার গানও শোনা হয়। সেইটি খারাপ হলে রিপেয়ার করতে নিয়ে গেল পাড়ার মিস্ত্রি। আর ফেরত আসেনি। সেই মিস্ত্রি গোপাল তাদের খুব ন্যাওটা। ছেলের সাইকেলটা নিয়ে গেল একবার এসে। সেই ভিডিও প্লেয়ার গেলে একটা নতুন কেনা হল যে। সেইটি আছে। সিডি আছে অনেক। কিন্তু কম্পিউটার আর ইন্টারনেট এসে সেই সিডি প্লেয়ারকে স্থবির করে দিয়েছে। ইউ-টিউবে গান শোনে অতীন। ইউ-টিউব থেকে গান ডাউনলোড করে মোবাইলে তুলে নেয় পর্যন্ত। দুপুরে ইউ টিউবে খুঁজেছে অতীন, সেই গান পায়নি। অতীন এমনি। অতীন এক এক সময় এক এক খেয়ালে ডুবে যায়। এই যে আচমকা ওর মনে পড়েছে সেই গানখানির কথা, না শুনে সে থামবে না। আচ্ছা, এমন যদি হয়, ওই গান চিরতরে মুছে গেছে এই পৃথিবী থেকে, তখন? এমন কি হতে পারে, শেষ রেকর্ডটিও ভেঙে ফেলেছে কেউ। সেই গায়কের তো এখনো বেঁচে থাকার কথা। তখন অতীনের বছর দশ, গায়ক অতুলানন্দের বছর পঁচিশ, তার মানে এখন তিনি তিয়াত্তর। তিয়াত্তরে কত মানুষ সুস্থ হয়ে চলাফেরা করছে, তাস খেলছে, পাশা খেলছে, মিছিলে যাচ্ছে, আবার বিয়েও করছে শোনা যায়, নতুন প্রেমে পড়ছে। তাহলে শেষ রেকর্ডটি ভেঙে গেলেও অতুলানন্দ আছেন আর সেই গান তাঁর স্মৃতিতে আছে। নিশ্চয় স্মৃতি লোপ হয়নি তাঁর। সব ভুলে যাননি তিনি। কে জানে কী হয়েছে? এই সব আগডুম বাগডুম ভাবতে

ভাবতে শম্পা পুরনো কাঠের আলমারিটি খুলল। এমন আলমারি এখন পাওয়া যায় না। খাঁটি বার্মা টিকের তৈরি, আয়নাটি কেমন ঝকঝকে। কী সুন্দর প্রতিবিম্ব আসে। এই আয়নার সামনে বহু সময় দাঁড়াতে ইচ্ছে হয়। মনে হয় প্রতিবিম্বটি তার যমজ। যমজ বলেই ওর প্রাণ আছে। সে যখন আয়নার সামনে থাকে না, তার যমজ এই আয়নার ভিতরে বসে ঘরটিকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দ্যাখে। দেখতে দেখতে ওর ভিতরে ঘুমিয়ে পড়ে। নিজে নিজে এই সব ভাবতে তার ভাল লাগে। যেন পুরনো গানের কলির মতই মনের ভিতর গুনগুন করে ভাবনাগুলি। শম্পা আলমারি খুলে দেখল কত জামা প্যান্ট পাঞ্জাবি পায়জামা। নতুন পাঞ্জাবি দুটি রয়েছে, শার্ট একটি। বিমল বিশ্বাসকে দিলে কি সে কিছু মনে করবে? নতুন একটি পাঞ্জাবিই না হয় দিল। শম্পার মন খুব নরম। সকাল থেকে সে ভাবছে দু'জনে এক ক্লাসে পড়ত, এখন একজন বাজারে থানকুনি পাতা বেচে, অন্যজন বড় চাকুরে। ফ্ল্যাট আছে। গাড়ি কিনবে কিনবে করছে। রিটায়ারমেনটের পর হবে। মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে। পুত্রটি পড়ছে। ইঞ্জিনিয়ার হয়ে যাবে কিছুদিন পর। বিমল বিশ্বাস যদি না নেয়? শম্পা নীল রঙের পাঞ্জাবিটি হাতে নিয়ে আবার ঢুকিয়ে দেয় ভিতরে। ল্যান্ড লাইনে ফোন বাজল। শম্পা জানে তার মা। মা এই ফোনেই ফোন করে। আর কখনো কখনো কোন বীমা কোম্পানি, বেসরকারি ব্যাংক তাদের ঘরে টাকা রাখতে বলে। আর আসে রং নাম্বার। ফোন তুলতেই শম্পার মা বললেন, তোর উমা কাকা মারা গেছে হঠাৎ।

মৃত্যু সংবাদ সমস্ত জীবন ধরেই আসতে থাকে। গত মাসেও এসেছিল লতিকা মামীর মৃত্যুর কথা। মা-ই দেয়। কেমন নিস্পৃহ গলায় বলে, লতিকা মারা গেছে।

কত বয়স হয়েছিল মা?

তিয়াত্তর হবে।

কী হয়েছিল? শম্পা জিজ্ঞেস করে।

কিছু হয়নি, ঘুমের ঘোরে, সুখের ঘুম। মা শান্ত গলায় বলল।

শম্পা চুপ করে থাকে, তারপর বলে, পরশু টিভিতে হার মানা হার দেখছিলাম, ওতে উমাকাকা ছিলেন।

হ্যাঁ, সাইড রোলে কত সিনেমায় নেমেছেন।

কী অদ্ভুত, তাই না? শম্পা বলে।

কেন?

এখনো দেখা যাবে, মনে হবে বনহুগলির মোড়ে দেখা হয়ে যাবে উমাকাকার সঙ্গে।

হুঁ। মা চুপ করে গেল। শম্পার বাবার চেয়ে বছর পাঁচেক ছোট উমাচরণ লাহা। কলকাতা পুলিশের ডেপুটি কমিশনার হয়েছিলেন প্রমোশনে প্রমোশনে। প্যাশন ছিল সিনেমায়। কিন্তু অভিনয় তেমন করতে পারতেন না। তাই দু-এক মিনিটের দৃশ্যেই খুশি। আসলে পুলিশের চাকরির সুবিধেতেও ছিল অভিনয়। আর সিনেমার চেয়ে বড় মিডিয়া এখনো হয়নি। উমাকাকার সঙ্গে উত্তমকুমারেরও ছবি আছে। বিকাশ রায়, কমল মিত্রও তাঁকে চিনতেন। পুলিশের সাহায্য কার না দরকার হয়।

মা বলল, খবরটা দিলাম।

শম্পা বলল, নন্দা এখন কোথায় মা?

ভুবনেশ্বরে, এসেছে শুনেই।

বাবুলের বউ?

সে তো চলে গেছে। বিনবিন করে বলল মা অনিতা।

বাবুল আর বিয়ে করল না?

মা অনিতা বলল, না, ও শুধু ঘুরতে যায়, এই তো ক'দিন আগে ফিরল নাগাল্যান্ডের একেবারে চিন বর্ডার থেকে।

কাকা একা ছিল তখন?

হ্যাঁ, কাজের বউটির স্বামী রাতে থাকত তখন, উনি তো ফিটই ছিলেন।

বাবুল বাইরে থাকলে যদি...। কথা শেষ করে না শম্পা।

সে তো হয়নি। নিস্পৃহ গলায় বলল মা অনিতা।

শম্পা বলল, তুমি সাবধানে থেকো।

মা অনিতা বলল, সাবধানের কী আছে, আমি তো পাহাড়ে চড়তে যাচ্ছি না।

শম্পা বলল, উমাকাকা চেকাপ করাতেন না?

বাবুল বলছে, না, প্রেশার মাপতেন না, অথচ ওঁর রুটিন চেকাপের কথা ছিল।

বাবুল কেন জোর করত না?

মা অনিতা বলল, দু'জনেই খুব দুঃখ পেয়েছিল রে, তনিমা চলে যেতে উমাদা ভেঙে পড়েছিলেন, তিনিই তো পছন্দ করে নিয়ে এসেছিলেন।

তনিমা এখন কোথায়?

কে জানে, শুনেছি লন্ডনে চলে গেছে শুভ্রব্রতর সঙ্গে।

চুপ করে থাকে শম্পা। শুভ্রব্রত বাবুলের মামাতো ভাই। কাহিনিটা খুব হৃদয় বিদারক। নারী-পুরুষের সম্পর্ক কোথা থেকে কোথায় যেতে পারে তা আন্দাজ করা কঠিন। মায়ের কণ্ঠস্বর একটু ঠাণ্ডা। মন খারাপ। একই পাড়ার বন্ধু প্রতিবেশীরা যদি চলে যায়, মন খারাপ হওয়ার কথা। সে ডাকল, ও মা মা।

কী বলছিস?

আচ্ছা তুমি এই গানটা শুনেছ? বলে নিজের মত করে গুনগুন করে ওঠে। মা অনিতা বলল, আর একবার গা দেখি।

শম্পা গাইল, নদীটি গিয়াছে চলিয়া, পথ পড়ে আছে ধুলায়...। মা অনিতা জিজ্ঞেস করল, কে গেয়েছিল?

তুমি শুনেছ কি?

বুঝতে পারছি না রে।

বুঝতে পারছ না মানে? শম্পা জিজ্ঞেস করে।

কার গান, শোনা শোনা মনে হচ্ছে।

মনে কর দেখি। শম্পা বলল।

কোথায় যেন শুনেছিরে, আবছা মনে পড়ছে। মা অনিতা ধীরে ধীরে বলল।

ইস, রেকর্ডে শুনেছ?

নাকি রাতে ভেসে এসেছিল কোনদিন ! বিড়বিড় করে অনিতা।

কী বলছ মা? শম্পার গলার স্বরে উদ্বেগ।

অনিতা বলল, অনেক রাতে ঘুম ভেঙে গেলে গান ভেসে আসে না, তেমনি গান মনে হয় এইটা।

থমথমে হয়ে যায় সবটা। শম্পা যেন সেই গভীর রাতের নিদ্রাহীনতা টের পায়। সেই নিদ্রাহীনতার ভিতরে এই গান ভেসে আসছে অন্ধকারে অন্ধকারে। নিদ্রাহীনতায় ডুবে আছে গানের সুর আর বাণী। শেষ রেকর্ডটি চূর্ণ হয়ে গিয়ে পথের ধুলোর মত তা ভেসে আছে অন্ধকার রাতের নিস্তব্ধতায় যেমন আছে বিগ ব্যাং, পৃথিবীর জন্ম মুহূর্তের আনন্দ বা কান্না। সে কি কোনদিন শুনেছে? তার কী ঘুম ভাঙে না মধ্য রাতে? কই মনে পড়ে না তো। শম্পা জিজ্ঞেস করে, মা ঠিক ওই গানই কি শুনেছ তুমি?

জবাব পায় না। অনিতা ফোন রেখে দিয়েছে।

সাত.

বিমল বিশ্বাস না করল না। খুশি হয়ে নিল পাঞ্জাবিটি হাতে, নেড়ে চেড়ে দেখল। পাঞ্জাবির চকোলেট রঙে হাত বুলোতে বুলোতে বলল, ভাল রং, ময়লা হবে না।

শম্পা বলল, প্রথম দিন এলেন, ক্লাস ফ্রেন্ড তো, তাই।

আমি নিয়ে করব কী? বিমল এবার মোক্ষম প্রশ্নটি করল।

শম্পা বলল, পরবেন।

আমার এই বুকে বোতামঅলা হাওয়াই শার্ট ভাল, দরকারে হাট আলগা করে দিয়া যায়, আমি এই পাঞ্জাবি পরলি লোকে হাসপে।

আপনি নেবেন না তো। শম্পা বলে ওঠে।

নেব, কিন্তু নিয়ে কী করব ভাবসি?

পরবেন, পাঞ্জাবি কী করে লোকে? শম্পা বলল।

হাসে বিমল, পরে লোকে তা জানি, কিন্তু আমি কী করব?

শম্পা চুপ করে থাকে। ভাবে লোকটা তো দুমড়োন মুচড়োন একটা মানুষ। টালা থানার সামনে দুর্ঘটনায় দুমড়ে যাওয়া ডাঁই করে রাখা গাড়িগুলোর মত। আচমকা তার মনে এল এই দৃশ্য। ধুলোর পরতে ঢেকে আছে গাড়িগুলো। থেঁতলে আছে হয় সামনেটা না হয় পেছনটা। আবার সাইডেও ধাক্কা পড়েছে একটির। বিমল কি তেমনি মানুষ। না তেমন তো

নয়। ওই মানুষের এই কথা! সে বলল, নেবেন না তো?

হ্যাঁ নেব, কিন্তু আছে একটা।

কী কিন্তু? শম্পা জিজ্ঞেস করে।

আমার জামাইরে দিয়ে দেব, বলেই দিলাম আমি। বিমল বিশ্বাস কথাটি বলে ব্যালকনির বাইরে হয়ে আসা সন্ধ্যার দিকে তাকিয়ে থাকল। আর কথাটা শুনে শম্পা বলল, যদি তার জন্য আর একটা দিই?

মাথা নাড়ে বিমল, না তা হয় না বউদি, তাতে আমার সুখ হবে না।

তার মানে? অতীন জিজ্ঞেস করল।

বিমল বলল, নিজির জিনিশ জামাইডারে দিয়ে যে সুখ তা কি আর একটা দিলি হয়, আমি বলব আমার অফিসার ক্লাস ফ্রেন্ডের বউ দেসে এটি আমার জন্যি, আমি তুমারে দিলাম তারকনাথ।

তাই! দু'চোখ আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে শম্পার, বলে, তাহলে তাই।

ই রকম তো দিয়া হয়, হয় কি না বল অতীন? বিমল সাক্ষী মানে অতীনকে।

অতীন বলে, তাই কর, শম্পার ইচ্ছে হল তাই দিচ্ছে, তুমি নিয়ে যাও।

শম্পা ভাবল বলবে কি উমাকাকার মৃত্যুর কথা? না থাক। বিমল বিশ্বাস বসেছে। লোকটার এতক্ষণে যেন বিশ্বাস হচ্ছে তাদের। শম্পা বলল, তার মা গানটি শুনেছে যেন কোথাও। ঠিক মনে করতে পারল না। মা যা বলেছিল তা শুনতে শুনতে অতীন বলল, লিরিকটা খুব ভাল, বাবা যে কেন আর গান লেখেননি।

বিমল খুব মন দিয়ে শুনল সবটা, তারপর বলল, আচ্ছা মাজরাতি যে ভেসে আসে গান, অত রাতি কুথায় গান হয় বল দিনি।

তুমি শুনতে পাও বিমলদা? শম্পা জিজ্ঞেস করে।

বিমল অবাক হয়ে শম্পার দিকে তাকিয়ে। এই একটা পুরোন রংজ্বলা লুঙ্গি, কেচেও ময়লার দাগ না ওঠা হাওয়াই শার্ট, কাঁচা পাকা চুল, আর খোঁচা দাড়ির লোক তো ভিখিরিও হয়। তার ভাই কাশী আর তার সিলেটি বউয়ের মনে দয়া আছে বলে সে না খেতে পেয়ে মরছে না। তারা দেয়। আর তার বউ তাদের লুকিয়েই ঝিগিরি করে। লোকের বাড়ি বাসন মাজে। সে থানকুনি ব্রাহ্মিশাক রসুনপাতা বেচে। সে তো ভিখিরিই বটে। ভিক্ষে না করা ভিখিরি। তাকে কী রকম মযার্দা দিয়ে কথা বলছে অতীন বসুর বউ। বাজারে অধিকাংশ লোক তো তাকে তুই তোকারি করে। খিস্তিও করে। সে বলল, হ্যাঁ পাই।

কখন পাও? শম্পা জিজ্ঞগেস করে।

গভীর রাতি, যখন সব কিছু থেমি যায়, তখন, আচ্ছা অতীন এখন কি লাস্ট ট্রাম ফেরে না বেলগেছে ডিপোয়?

অতীন অবাক। তাই তো। সেই যে সাড়ে বারোটা নাগাদ বেলগাছিয়া ব্রিজ কাঁপিয়ে শেষ ট্রাম ফিরত ধর্মতলা থেকে, তার আওয়াজে ঘুম ভাঙত প্রায়ই, সেই ট্রাম কোথায় গেল? বিয়ের পর ফিরছিল তারা দীঘা থেকে। মাঝ রাস্তায় বাস বিগড়ে ঘণ্টাচারেক গেল। তখন দীঘা মানে ভায়া যক্ষপুর। হলদি নদীর উপরে নরঘাট ব্রিজ হয়নি। তখন দীঘাও ছিল অনেক দূরের। সেই বাস কলকাতায় পৌঁছল রাত বারোটা নাগাদ। তারা শেষ ট্রাম পেয়ে গিয়েছিল। এখন সেই লাস্ট ট্রাম উঠে গেছে। আর রাত সাড়ে চারটেয় ফার্স্ট ট্রাম? সেই ট্রামের আওয়াজে ঘুম ভেঙে যেত। গরমের সময় তারা ফুটবল নিয়ে বেরিয়ে পড়ত। সেই সব কথা হুড়মুড়িয়ে ভেসে আসতে লাগল এই সন্ধ্যায়। শীতের সময় লাস্ট ট্রাম চলে গেলে আবার ঘুম। নাহ, নেই। উঠে গেছে। মাথা নাড়তে লাগল অতীন।

বিমল জিজ্ঞেস করল, লাস্ট ট্রাম চলে গেছে মিতে?

হ্যাঁ গেছে। অতীন অস্ফুটে বলল।

ফাস্ট ট্রাম?

সেও চলে গেছে। বলল শম্পা। তার বেশ ভাল লাগছিল লোকটাকে। সে বিয়ে হয়ে এই পাড়ায় এসে শোনেনি কি কাছিমের পিঠের মত ওই ব্রিজ কাঁপিয়ে শেষ ট্রাম ফিরছে। তখন তাদের নতুন বিয়ে। অনেকটা রাত জাগাই হত। আর তাই ভোরে সেই ঘুম গাঢ় হলে, তা কেঁচিয়ে দিত ফার্স্ট ট্রাম। সমস্তদিন কিন্তু ট্রামের শব্দ পাওয়া ভার। মনে পড়ে গেল। মনে পড়ে গেল প্রথম ভালবাসার দিনগুলিকে। মনে পড়ে গেল সেই মধুরতার কথা। তাও বুঝি ভেসে আছে ইথার তরঙ্গে। সেই সব কথা, অস্ফুট উচ্চারণ!

কবে ফাস্ট টাম গেল মিতেনি? বিমল জিজ্ঞেস করে।

শম্পার কী ভাল লাগল কথাটা। সে বুঝি এ জীবনে শোনেনি মিতেনি শব্দটি। মিতা-মিতেই বা কে বলেছে কবে? বইয়ের পাতা থেকে বাতাসে নেমে এল যেন। সে জিজ্ঞেস করল, আপনি এখনো রাতে শুনতে পান গান?

না, কিন্তু আবার শুনিও যেন, আচ্ছা গানগুলো কোথা থেকে আসে বল দেখি। বিমল জিজ্ঞেস করল দু'জনকেই। অত রাতে কে বাজায় বাঁশি। কে গায় গান, কাদের কুলের বউ গো তুমি, কাদের কুলের বউ... বড় লোকের বিটি গো, লম্বা লম্বা চুল...।

তুমি শোন সত্যি মিতে? শম্পা বলল।

হ্যাঁ মিতেনি, আমার এই ছোট্ট ঝুড়ি, এতে রাম রাবণ আছে... মনে আছে মিতে? অতীনকে জিজ্ঞেস করল বিমল।

অতীন বলল, কিন্তু সেই যে নদীটি গিয়াছে চলিয়া...।

শুনা হয় মনে হয়।

অতীন বলে, কী করে শোনা হবে?

ভেসে আসে বাতাসে, ঢেউয়ে ঢেউয়ে কাঁপতে কাঁপতে, আসে মিতে আসে।

তাহলে ওই গান বাজে কোথাও না কোথাও ? শম্পা জিজ্ঞেস করে, খোঁজ করলে পাব তো নিশ্চয়।

তা জানিনে। বিমল জবাব দেয়।

না বাজলে তুমি শুনবে কী করে বিমলদা? শম্পা জিজ্ঞেস করে।

ভেসে থাকতি পারে, অত রাতি কেউ মাইক বাজাতি পারে?

পারে না? শম্পা জিজ্ঞেস করে।

না পারে না, অতীন বলল, পুলিশ মাইক তুলে নিয়ে যাবে।

তবে কী করে বাজে? শম্পা জিজ্ঞেস করে আবার।

বিমল বলে, আমার কথায় তুমি হাসবা মিতেনি, কিন্তু গান আমি শুনিছি।

হাসব না, তুমি বল কী করে শোনা যায়। শম্পা বলে।

বিমল বিশ্বাস বলল, ভাসানো আছে হয় তো।

তার মানে? অতীন ঝুঁকে পড়ে বিমলের দিকে। তখন গ্রীষ্মের অন্ধকারে কলকাতার আকাশ দিয়ে এক পুরনো বাদুড় উড়ে গেল আরো রাত্রির দিকে। ত্রিফলা আলোর একটি আচমকা নিভে গেল, অটো রিকশার জটের ভিতরে পড়ে এক বৃদ্ধ যেতে পারছেন না থেমে থাকা বাসের দিকে। নীলু রায় এখনো বসে আছে কদম গাছের নিচে। ইট বালির দোকানদার খেলারাম তাকে ঘরে দিয়ে যাবে।

বিমল এরই ভিতরে বলছে, বাতাসে অনেক গান ভেসে থাকে গো মিতে।

কে বলল এই কথা? শম্পা জিজ্ঞেস করে।

আমার মনে হয় তাই, কোন শব্দ হারায় না।

তার মানে? অতীন কেমন উত্তেজনা অনুভব করছে ভিতরে।

এই যে কথা বলছি আমরা, তা জগতের বাতাসে বল, অন্ধকারে বল, রাতির ভিতরে বল, ধরা হয়ে যাচ্ছে।

তারপর? শম্পা জিজ্ঞেস করে।

সেই রকম গান সব আছে অন্ধকারে ভেসে, সব চুপ করে গেলে, নিথর হয়ে গেলে ভেসে আসে মিতে, কথাটা মিথ্যে না, আমি এক সাধুরে বলেসিলাম, তিনি বলেসিল আমি ঠিক বলেসি, একদম কারেক্ট।

শম্পা বলল, আমার মাও শুনতে পায়।

চাইলিই শুনা যাবে, যায়, তুমরাও পাবা। বলল বিমল বিশ্বাস।

আহা। অতীন গুনগুন করে ওঠে গানটি। তা শুনে বিমল বলে, শুনেছে সে, ঠিক শুনেছে, অনেক রাতে, ঘুমের ঘোরে হয় তো, চোখে জল এসে গিয়েছিল তার। আহা মনে হয় ওই গানে দুঃখ আছে, লাস্ট ট্রাম ফাস্ট ট্রাম...। বিমল চুপ করে যায় বলতে বলতে। মাথা নামিয়ে নেয়। তার কানের ভিতরে আবার প্রবেশ করছে সেই সুর। সেই গান।

• পরবর্তী সংখ্যায়

অমর মিত্র
সাহিত্য একাডেমি পুরস্কারপ্রাপ্ত ভারতীয় লেখক

ছোটগল্প

হিমঘ্ন ময়ূখ

অনন্যা দাশ

বাইরে মাইনাস কুড়ি ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড, তবে ভিতরের তাপমাত্রা আরো কম! মানে গাড়ির ভিতরটা নয়, সেখানে তো গনগনে গরম, হিটার চলছে। কিন্তু মনের ভিতর যে চাঁই চাঁই বরফ জমাট বেঁধে রয়েছে তার কথা ভাবছিল তৃতা। বাইরেও অবশ্য বরফের স্তূপীকৃত রাশি। এখনও ঝুরঝুরে বরফ পড়েই চলেছে। কত ইঞ্চিতে গিয়ে থামবে তার ঠিক নেই। টিভি বা রেডিওতে বলছে নিশ্চয়ই কিন্তু কোনটাই শোনার সময় বা ইচ্ছে তৃতার নেই। তার খালি মনে হচ্ছে ফ্লাইটটা ঠিক সময় উঠলে হয়? শেষবার যখন এয়ারপোর্টে ফোন করেছিল তখনও তো ওরা বলল ফ্লাইট ঠিক সময়েই ছাড়বে যদিও সেটা আরো পাঁচ ঘণ্টা পরের ব্যাপার, ততক্ষণে কি যে হবে। তৃতা ভারতে ফিরে যাচ্ছে আজকে, চিরকালের জন্যে। আর আসতে চায় না সে এই পোড়া মার্কিন দেশে! ফিলাডেলফিয়া এয়ারপোর্ট থেকে ওর প্লেনটা ছাড়ার কথা বিকেল পাঁচটা নাগাদ।

তার মানে এয়ারপোর্টে পৌঁছতে হবে তিনঘণ্টা আগে অর্থাৎ দুটো। ওদের বাড়ি থেকে এয়ারপোর্ট দু'ঘণ্টার পথ তাই সব কিছু হাতে রেখে বেলা এগারটায় সময় বেরিয়েছে ওরা। রাস্তায় যেতে যেতে অমিতের হঠাৎ কি মনে হল, এই বাজারে এসে গাড়িটা পার্ক করল। কি নাকি কিনতে হবে ওকে।

ফেরার সময় নাকি রাস্তার অবস্থা আরো খারাপ হয়ে যাবে তাই। 'তুমি গাড়িতেই বসো। ইঞ্জিনটা চালু রয়েছে তাই ঠাণ্ডা লাগবে না। আমি এখুনি আসছি', বলে তৃতা কোন প্রতিবাদ করার আগেই অমিত ঝট করে গাড়ির দরজা খুলে বেরিয়ে গেল।

উদাসভাবে গাড়ির জানালা দিয়ে বাইরে চেয়ে রইল তৃতা। কয়েকটা হলুদ রঙের বরফ পরিষ্কার করার গাড়ি ক্রমাগত ঘুরে ঘুরে পার্কিং লট থেকে বরফ সরিয়ে চলেছে। বেশি গাড়ি নেই পার্কিং লটে তাই সুবিধাই হচ্ছে বরফ সরানো গাড়ির ড্রাইভারগুলোর। খুব খাটছে লোকগুলো। অবশ্য এই সময়ে যাদের ওই ধরনের বরফ-সাফাইয়ের গাড়ি আছে তাদের পোয়া বারো। ঠাণ্ডায় রাস্তায়, ব্রিজের তলায় পড়ে থাকা হোমলেসগুলো মারা যাচ্ছে আর কিছু লোকের পকেট গরম হচ্ছে। কারো সর্বনাশ কারো পৌষ মাস আর কি। তবে সেটাই বোধহয় সৃষ্টির নিয়ম, চারপাশের সাদা পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে ভাবছিল তৃতা। ঘুরে ফিরে অবশ্য চিন্তাগুলো এক জায়গাতেই ফিরে এসে ধাক্কা খাচ্ছিল। ও তো সবে তিন মাস হল এসেছে, ওর তো এখনই ফিরে যাওয়ার কথা নয়! এটা তো ওদের মধুচন্দ্রিমার দিন হওয়ার কথা ছিল তার বদলে কিনা... গাড়ির সিডি প্লেয়ারে রবীন্দ্রসংগীত বেজে চলেছে– 'নয়ন ছেড়ে গেলে চলে...' ঝপ করে বোতাম টিপে গানটা বন্ধ করে দিল তৃতা।

নিস্তব্ধতায় চোখ বুজে বসে রইল সে।

দুই.

অমিতের সঙ্গে তৃতার আলাপ ইন্টারনেটে। অর্কুট, ফেসবুক, ইমেলে ওদের প্রেম। বিয়ের প্রস্তাব দেওয়ার আগে অমিত তৃতাকে দেখেনি। তৃতাও অবশ্য অমিতকে দেখেনি, দু'জনেই দু'জনের ছবি দেখেছিল শুধু। ওদের ইন্টারনেট প্রেমের ফলস্বরূপ অমিতের মা-বাবা আর দাদা তৃতাদের বাড়িতে এসে ওকে দেখে গিয়েছিলেন। তৃতাকে ওদের ভাল লাগতে বিয়ের সবকিছু পাকা হয়ে যায়। এক সপ্তাহের ছুটি নিয়ে কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার অমিত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে ভারতে গিয়ে ওকে বিয়ে করেছিল। অমিত ফিরে আসার একমাস বাদেই তৃতা এদেশে এসেছিল। সেই ঝরা-পাতার নভেম্বর মাসে। চারিদিকে গাছের পাতাগুলো তখন লাল, কমলা, হলুদ হয়ে ঝরে ঝরে পড়ছে। দোতলা বাড়ির পিছনের ব্যালকনিতে বসে নীল আকাশ আর ঝরা-পাতার রাশি দেখে অনেক কবিতা লিখে ফেলেছিল তৃতা। মা তো বলতেন, 'তোমার প্রতিটা চিঠিই যেন একখানা করে কবিতা।' ইন্টারনেট থেকে পড়ে পড়ে, এটা-সেটা রান্না করতেও শিখে নিয়েছিল তৃতা। কখনও বা আটকে গেলে মাকে ফোন, 'মা অমুক রান্নাটা কি করে বল তো?'

ইন্ডিয়াতে ফোন করা যখন ফ্রি তখন তো আর ফোন করতে দ্বিধা নেই। মা আর দিদির সঙ্গে রোজই কথা হয়। অমিতের প্রায়ই রাত হয়, তবে তৃতার অসুবিধা হয় না। সিনেমা দেখে, বই পড়ে, ফোনে কথা বলে, কবিতা লিখে তার দিব্যি কেটে যায়। শনিবার-রবিবারগুলোতে অমিতের বন্ধুদের বাড়িতে নিমন্ত্রণ। তৃতা নতুন বউ তাই সবাই ওদের ডেকে খাওয়াতে চায়। অমিত অবশ্য বলত, 'এখন খাচ্ছ খাও এরপর আমাদেরও ওদের পাল্টা নিমন্ত্রণ করে খাওয়াতে হবে, না হলে সব দাদা-বৌদিদের মুখ হাঁড়ি হবে। তবে সময় আছে, চিন্তা নেই। তুমি রান্নার হাতটা আরেকটু পাকিয়ে নাও তারপর একদিন ঢেলে সবাইকে ডেকে নেবক্ষণ।' নতুন বউ সম্পর্কে সবার কৌতূহল স্বাভাবিক। কিভাবে পরিচয় হল ইত্যাদি প্রশ্ন। তা তৃতা তৈরিই ছিল তাই কোন অসুবিধা হয়নি। সবকিছু ঠিকঠাকই চলছিল। প্রথম খটকাটা লাগল পারমিতাদিদের বাড়িতে। পারমিতাদি স্টেটের বড় চাকরি করেন। অমিত আর ওর বন্ধুদের ধারণা উনি রাজনীতিতে প্রবেশ করতে চান অচিরেই। ওর স্বামী শ্যামলদা ওর ব্যক্তিত্বর কাছে কেঁচো যদিও তিনিও ভাল চাকরিই করেন। একটি মেয়ে ক্যালিফর্নিয়াতে থাকে। ওরা মাঝে মাঝে যান তার কাছে। তা সে হেন পারমিতাদি আরো কয়েকটা পরিবারের সঙ্গে তৃতাদেরও নিমন্ত্রণ করেছিলেন এক শনিবার বিকেলে। অমিত বোধহয় সময়টা শুনতে ভুল করেছিল কারণ অন্য কেউ পৌঁছবার আগেই ওরা পৌঁছে গেল।

পারমিতাদি দরজা খুলে ওদের আপ্যায়ন করলেন। ওরা বসতে উনি কললেন, 'অমিত তো বিয়ার খাবে জানি। তুমি কি খাবে অবন্তিকা?'

তৃতা একটু হেসে বলল, 'আপনি ভুল করছেন। আমার নাম অবন্তিকা নয়, তৃতা।'

'ও সরি, তৃতা!' বলে নিজেকে সামলে নিলেন পারমিতাদি কিন্তু অমিতের দিকে এমন একটা অর্থময় চাহুনি নিক্ষেপ করলেন যে তৃতার কৌতূহল আরো ঘনীভূত হল। পার্টি শেষে বাড়ি ফেরার পথেই সে অমিতকে চেপে ধরল, 'অবন্তিকা কে?'

'একটা মেয়ে আবার কে! তুমি পারমিতাদির কথায় কান দিও না তো? মহিলা এক নম্বর গসিপ! দু'দিনে তোমার ঘিলু উল্‌টো পাল্টা করে দেবেন।'

'ও অবন্তিকা সম্পর্কে জানলে বুঝি আমার ঘিলু ওলট পালট হয়ে যাবে?'

'আরে বাবা ইন্টারনেট ডেটিংয়ের ব্যাপারটা তো জানই। একশোটা নুড়ি পাথর নেড়েচেড়ে তারপর একটা রত্ন খুঁজে পাওয়া যায়। আর পারমিতাদির সঙ্গে আমার কথা হয় বছরে একবার। তখন হয়তো অবন্তিকা বলে কারো সঙ্গে কথা বলছিলাম সেটাই ওনাকে বলেছিলাম ব্যাস সেটা মনে রেখে দিয়েছেন।' ব্যাপারটা তখন ধামাচাপা পড়ে গেল কিন্তু তৃতার মনের খুঁত খুঁতটা গেল না। অমিতের অর্কুট ফেসবুক সব অ্যাকাউন্টে ঢুকে তন্নতন্ন করে খুঁজেও কিছু দেখতে পায়নি।

তারপর গত শুক্রবার তৃতা বাড়িতে বসে টিভি দেখছিল এমন সময় ওদের পাশের বাড়ির মহিলা মেলিসা এসে বললেন, 'আমি গাড়ি নিয়ে নিউ বার্গ যাচ্ছি আমার এজেন্টের সঙ্গে মিটিং আছে। তুমি যাবে? আমার মনে হল তুমি নিশ্চয়ই এই ঠাণ্ডায় একা একা বাড়িতে বসে বসে বোর হচ্ছে! ওখানে মল-টলে ঘুরলে তোমার একটু ভাল লাগবে।' মেলিসা আর্টিস্ট। যদিও মডার্ন আর্টের তৃতা কিছুই বোঝে না তাও মেলিসার ছবিতে রঙের একটা উচ্ছ্বাস থাকে যেটা মনকে নাড়া দেয়। ওর স্টুডিও বাড়িতে, কিন্তু মাঝে মাঝে নিউ বার্গ যেতে হয় এজেন্ট বা ক্লায়েন্টের সঙ্গে দেখা করতে। তৃতা বলল, 'আরে নিউ বার্গ মলের পাশেই তো অমিতের অফিস। লাঞ্চের সময় তাহলে ওকে গিয়ে সারপ্রাইজ দেব!'

মেলিসা হেসে ফেললেন, 'দারুণ আইডিয়া! তুমি ওকে বলতে পারো তোমাকে কোন ভাল রেস্টুরেন্টে লাঞ্চ খাওয়াতে নিয়ে যেতে। আমরা লাঞ্চ টাইমের আগেই ওখানে পৌঁছে যাব। চারটে নাগাদ আমার মিটিংটা শেষ হয়ে যাবে। তখন যদি তুমি আমার সঙ্গে ফিরতে চাও তাহলে আমরা মলের মাঝখানের ফোয়ারাটার কাছে দেখা করতে পারি। অবশ্য তুমি চাইলে অমিতের সঙ্গেও ফিরতে পার। তৃতা বলল, 'না, না আমি তোমার সঙ্গেই ফিরে আসব, অমিতের ফিরতে অনেক রাত হয়।' বেশ একটা চনমনে ভাব অনুভব করল তৃতা। সত্যি এই ঠাণ্ডায় ঘরে একা বসে থেকে বেশ নিরুৎসাহিত বোধ করছিল সে। ক্রিসমাস নিউ ইয়ারটা হইহই পার্টি করে কেটে গেল কিন্তু তারপর জানুয়ারিটা কি বোরিং! বরফও প্রথম প্রথম ভাল লাগছিল এখন আর নতুনত্ব কিছু নেই।

'মিনিট পনেরো বাদেই বেরোব আমি। তুমি তৈরি হয়ে নিতে পারবে তো?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ!'

তৃতাকে যখন মেলিসা নিউ বার্গে অমিতদের অফিসের সামনে নামিয়ে দিলেন তখন বারোটা বাজে। অমিতকে সারপ্রাইজ দেবে বলে তৃতা ওকে ফোন করে কিছু বলেনি। মনে মনে আশা করছিল যে অমিতের খাওয়া যেন না হয়ে থাকে। না হলে বাইরে খাওয়ার পরিকল্পনাটাই মাটি হয়ে যাবে। ওরা হয়তো আরেকটু আগে পৌঁছতে পারত কিন্তু শহরে ঢোকার মুখে জ্যাম ছিল। লিফ্‌টে করে তিন তলায় উঠে তৃতা অমিতদের অফিসের সুসজ্জিত রিসেপশান চত্বরে ঢুকল।

রিসেপশনিস্টের চেয়ার খালি, হয়তো লাঞ্চে গেছে। চারপাশের দরজাগুলোর দিকে তাকাতে একটা দরজায় অমিতের নামটা দেখতে পেতে

তৃতার বেশি সময় লাগল না। হাত ব্যাগটাকে চেপে ধরে দরজার কাছে গিয়ে হাতলে চাপ দিয়ে হঠাৎ দরজাটা খুলে ফেলল তৃতা। আর সেখানেই শেষ– স্তব্ধ হয়ে গেল তৃতার জীবন। অমিতের কোলে বসে তাকে জড়িয়ে ধরে রয়েছে সুন্দরী একটা মেয়ে। তার চুলগুলোতে সোনালি হাইলাইট, ফর্সা পান পাতার আকারের মুখে টুকটুকে লাল ঠোঁট। তৃতা অসুন্দর নয় কিন্তু এ মেয়ের ধারে কাছে নয় সে। আর একটা মুহূর্তও ওখানে দাঁড়ায়নি তৃতা। অমিত কিছু বুঝে উঠবার বা বলবার আগেই সে ছুটে ওখান থেকে বেরিয়ে গেল। যাওয়ার পথে বিশাল গগনচুম্বী সিনেমার পোস্টারের মতন ওর চোখের সামনে জ্বলজ্বল করে উঠল রিসেপশনিস্টের টেবিলে রাখা তার নামের ফলকটা– অবন্তিকা রত্নম্! অথচ যখন ঢুকেছিল তখন এটা চোখেই পড়েনি, তাহলে হয়তো একটু থমকাত তৃতা! ওর হঠাৎ মনে পড়ে গেল ওর আত্মীয়-স্বজনরা অনেকেই বলাবলি করছিল ইন্টারনেট থেকে পছন্দ করে বিয়ে করলে অনেক সময়েই পরিণতি ভাল হয় না। কিন্তু ওদের কথাকে হিংসের প্রলাপ ভেবে কানও দেয়নি তৃতা। চোখে রঙিন স্বপ্নের চশমা পরেছিল সে, এখন সেই স্বপ্ন ছিন্নভিন্ন হয়ে যেতে সব কিছু পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে। সেল ফোন অফ করে দিয়ে বিকেল চারটে পর্যন্ত কোন রকমে এ দোকানে সে দোকানে গা ঢাকা দিয়ে বসে রইল তৃতা। চারটের সময় ফোয়ারার ধারে এসে দাঁড়াল মেলিসার অপেক্ষায়!

মেলিসা তো ওকে দেখে ভূত দেখার মতন চমকে উঠলেন, 'একি চেহারা করেছ। কি হয়েছে তোমার?'

ওকে কিছুই বলেনি তৃতা, বলে কি হবে ভেবে। কিছুটা নিশ্চয়ই আন্দাজ করেছিলেন মেলিসা কিন্তু আর কিছু বলেননি সারাটা পথ।

অমিতের কাছে কোন কৈফিয়ত কোন সাফাই শুনতে চাইনি তৃতা। কেবল একটা কথাই বলেছিল, 'আমি কিছু শুনতে চাই না, আমাকে শুধু ভারতে ফেরার একটা টিকিট কেটে দাও।'

অনেক চেষ্টা করেও যখন তৃতাকে একটা কথাও শোনাতে পারেনি তখন অগত্যা ওর ভারতে ফেরার টিকিট কেটে দিয়েছিল অমিত। তৃতা আর কিছু বলেনি। অমিত কিছু বলতে গেলে সেখান থেকে উঠে চলে গেছে। সে যেন নিজেও বাইরের ওই বরফের মতন নিরুত্তাপ হয়ে পড়েছে। নিজে শরীর মন থেকে বিচ্যুত অন্য তৃতীয় ব্যক্তির মতন ভাবলেশহীন দৃষ্টিতে সবকিছু দেখে চলেছে অথচ কোন প্রতিক্রিয়াই নেই।

তিন.

'রাস্তার অবস্থা খুব খারাপ, ফিরে যাব? টিকিটটা ক্যান্সেল করে অন্য দিনের করে...'

অমিত ফিরে এসেছে। কালো স্মৃতিগুলো এতটাই ঘিরে ধরেছিল তৃ তাকে যে সে দরজা খোলার হিমেল পরশও পায়নি। 'না।' অমিতের কথায় উত্তেজনায় প্রায় চিৎকার করে উঠল তৃতা, 'এদেশে আর একটা দিনও বেশি আমি থাকতে চাই না।'

'কিন্তু দোকানেও ওরা বলাবলি করছিল...'

'না!' নিজেকে সংযত করে দৃঢ়ভাবে তৃতা আবার বলল। এখানে থাকতে হবে ভেবে ওর মাথা ফেটে যাবে মনে হচ্ছে। অসহায়ভাবে ওর দিকে একবার তাকিয়ে গাড়ি পার্কিং লট থেকে বার করে রাস্তায় নিয়ে গেল অমিত। আশপাশে গাড়িটাড়ি নেই বেশি। এই দুর্যোগের দিনে আর কেই-বা বেরোবে। ঝুরো ঝুরো বরফ পড়েই চলেছে। সঙ্গে জোর হাওয়া। রাস্তা পরিষ্কার হয়েছিল কি হয়নি বোঝা দায়, কারণ হাওয়ার সব বরফ আবার রাস্তার মাঝখানেই এনে ফেলেছে। তাই রাস্তা-পরিষ্কার গাড়িগুলো কাজ করে করে ক্লান্ত হয়ে হাল ছেড়ে দিয়েছে। ডাঁই হয়ে জমা হয়ে চলেছে বরফ চারিদিকে।

বেশিক্ষণ যেতে হল না। একটা ছোট রাস্তায় পড়ে গাড়ির চাকা হড়কে গাড়ি স্কিড করে রাস্তার ধারের এক বরফের ডাঁইয়ের মধ্যে ঢুকে গিয়ে আটকে গেল। অনেক চেষ্টা করল অমিত কিন্তু কিছুই হল না। চাকা ঘুরেই চলল অথচ গাড়ি এক চুলও নড়ল না। শেষে সেল ফোনে পুলিশকে ফোন করল। ওরা কোথায় আছে জেনে নিয়ে পুলিশ বলল, 'কোন উপায় নেই। ওখানে রেসকিউয়ের গাড়ি কখন পৌঁছবে আমরা বলতে পারছি না। বিশাল তুষারপাতে শয়ে শয়ে গাড়ি আটকে রয়েছে চারিদিকে। হাইওয়েতে কুড়িটা গাড়ি পাইল-আপ হয়ে দুর্ঘটনা ঘটেছে। বীভৎস অবস্থা। রাস্তাঘাটের দশা সাংঘাতিক খারাপ।'

তারা আরো বলল, 'গরম থাকার চেষ্টা কর। ওয়েদার ফোরকাস্ট যা বলছে তাতে তুষারপাত কালকেও চলবে। ফ্লাইট ধরার কথা মাথাতেও এনো না। এমনিতেও ফিলাডেলফিয়া এয়ারপোর্টের দশাও ভয়াবহ, শয়ে শয়ে ফ্লাইট ক্যান্সেল হয়ে গেছে এবং আরো হবে, সেল ফোন এমারজেন্সি ছাড়া আর কোন না। কারণ ঠাণ্ডায় ব্যাটারি ডাউন হয়ে যায়। গাড়ির স্টার্ট কিছুক্ষণের জন্যে চালিয়ে একটু করে গরম করে বন্ধ রেখো।' ইত্যাদি ইত্যাদি।

ওরা এটা-সেটা বলেই চলল। রাগে, দুঃখে, অসহায়তায় কেঁদে ফেলল তৃতা। আজকেই কিনা এত বরফ পড়তে হল? বিধাতা কেন এত নির্দয়, এত নিষ্ঠুর! অমিত নেমে গিয়ে ছুটে গাড়ির পিছনের ট্রাঙ্ক থেকে দুটো কম্বল নিয়ে এল।

'ভাগ্য ভাল এগুলো গাড়িতেই ছিল। এই নাও এটা গায়ে দাও। আমাকে এঞ্জিন বন্ধ করতে হবে। ওরা কখন আসবে তার ঠিক নেই। রাত হলে ঠাণ্ডা আরো বাড়বে। এরপর আর গাড়ির দরজাও খোলা যাবে না মনে হচ্ছে।'

অমিত চুল আর গা থেকে ঝুরো ঝুরো বরফ ঝাড়তে ঝাড়তে বলল।

কাঠের পুতুলের মতন ওর হাত থেকে কম্বলটা নিয়ে গায়ে দিল তৃতা।

বাইরে তাকিয়ে দেখল। বরফ পাক খাচ্ছে, ওদের চারিদিকে কিছু দেখা যাচ্ছে না। বরফের পাহাড়ের তলায় বন্দী হয়ে গেছে ওরা দুজনে। একটা অজানা ভয়ে বুকটা ধক করে উঠল তৃতার। গাড়ির স্টার্ট বন্ধ করার কিছুক্ষণের মধ্যেই গাড়ির ভিতরটা হুহু করে ঠাণ্ডা হতে শুরু করল। স্যাঁত স্যাঁতে হাড় কাঁপানো একটা ঠাণ্ডা। সব জামা কাপড় পরে কম্বল নিয়েও মানাচ্ছে না।

'সুটকেসে সোয়েটার আছে আরো?'

'হ্যাঁ।'

'তাহলে সেগুলো বার করে পরে নাও।'

পিছনের সীটে গিয়ে সুটকেশ খুলে আরো কয়েকটা সোয়েটার পরে বসল। তাও যেন ঠাণ্ডা যায় না!

কিছুক্ষণের জন্যে ঘুমিয়ে পড়েছিল তৃতা। রেডিও চলার শব্দে ঘুমটা ভাঙল। ইঞ্জিন আবার চালু করেছে অমিত।

'স্টেট অফ এমারজেন্সি ডাকা হয়েছে। রাজ্যের পুলিশ সব ড্রাইভারদের সাবধান করছে গাড়ি নিয়ে রাস্তায় না বেরোতে। বলছে দরকার না হলে বাড়ি থেকে বেরোবেন না কেউ। বরফ পরিষ্কার করার গাড়িগুলো একটুখানি জায়গা পরিষ্কার করতে না করতে হাওয়ায় আবার সেই বরফ রাস্তাতেই ফিরে আসছে।'

'এটা খেয়ে নাও।' একটা বাদামের এনার্জিবার ওর দিকে এগিয়ে দিল অমিত।

একটা কামড় দিয়ে ওর মনে হল, 'আরে এটা তো বাদামের। অমিতের তো চিনেবাদামে অ্যালার্জি।'

ওর মনের কথা বুঝে অমিত বলল, 'ওটা তোমার জন্যে কেনা। আমি আশঙ্কা করেছিলাম এইরকম একটা কিছু হতে পারে তাই...। বাদাম ছাড়া অন্যগুলো তো তোমার পছন্দ নয়।'

সেটা অবশ্য ঠিকই।

'তবে এগুলোও বেশি নেই। সামলে সামলে খেতে হবে। আবার শরীর গরম রাখতে খাওয়া চাই। কি যে করব বুঝতে পারছি না।'

বাইরে মাইনাস দশ কি পনেরো ডিগ্রি। গাড়ির ইঞ্জিনটা চালু করে রেডিও চালালে তাপমাত্রার কথা বলছে মাঝে মাঝে। তৃতার মনে হয় এস্কিমোরা তো এই রকম প্রতিকূল আবহাওয়ায় সারাটা জীবন কাটিয়ে দেয়। তবে ওদের তো জীবনযাত্রাই এই রকম তাই ওরা তৈরি পোশাক-আসাক ঘর বাড়ি সব নিয়ে। তৃতাদের মতন সুখী প্রাণী তো ওরা নয়। ভয়ঙ্কর কষ্ট সহ্য করতে অভ্যস্ত।

বারটা খেয়ে ভাল লাগল। তাড়াহুড়োতে বাড়ি থেকে কিছু খেয়েও বেরোয়নি। খেয়েদেয়ে কম্বলমুড়ি দিয়ে পিছনের সীটে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়ল তৃতা।

'একটা লোক সাতদিন এই রকম অবস্থায় টিকে ছিল।' তৃতার ঘুম

ভাঙতে অমিত দুম্ করে বলল।

'কি করে জানলে?'

'অরিন্দম ফোন করে বলল। ও ইন্টারনেটে চেক করেছে। লোকটা কি কি করেছিল সব বলল।'

তৃতা কোন উত্তর দিল না। অরিন্দম আর ওর বউ প্রথা গত সপ্তাহে ওই অবন্তিকার ঘটনাটার পর ওদের বাড়িতে এসেছিল। তৃতা বেডরুমে লুকিয়ে বসেছিল, ওদের মুখদর্শনও করেনি।

চার.

এমনি করে সারা দিনটা গড়িয়ে গেল। একটা গাড়ির মধ্যে বসে থেকে কি আর না কথা বলে থাকা যায়? একটু-আধটু কথা বলতেই হল তৃতাক। ধীরে ধীরে রাত নেমে এল। আবার দিন আবার রাত, এইভাবে দুটো দিন কেটে গেল। জল আর খাবার যা ছিল তা দিয়ে দু'দিন কোনরকমে চলল। তারপর বরফ গলা জল খেতে হল দু'জনকে। তৃতীয় দিনও যখন কেউ এল না তখন খিদে আর ঠাণ্ডায় ওরা দু'জনে একেবারে হতাশ হয়ে পড়ল। এদিকে গাড়ির তেল প্রায় শেষ, সেল ফোনের ব্যাটারিগুলো গেছে। কার চার্জার ওদের কোন দিনই ছিল না।

শেষবার পুলিশকে ফোন করতে ওরা বলেছিল ওদিকের রাস্তায় এত গাছ পড়েছে যে সেগুলোকে না সরিয়ে রাস্তা পরিষ্কার করা যাচ্ছে না, এদিকে স্তূপাকার বরফ ঠাণ্ডায় জমে শক্ত হয়ে গেছে। অমিত মাঝে মাঝে নেমে গাড়ির ছাদ আর আশপাশ থেকে বরফ সরাচ্ছিল একটু বাদে বাদে। একবার তো অমিত নেমে সাহায্য খুঁজতে যেতে চাইছিল কিন্তু তৃতা যেতে দেয়নি। ওরেগানের কিম ফ্যামিলির কথা ভেবে ওর বুক কেঁপে উঠল। স্যানফ্রান্সিসকো থেকে ওরেগন যেতে গিয়ে এইরকম তুষারপাতে আটকে যায় ওরা। কয়েকদিনের মধ্যেই পেট্রল শেষ করে গাড়ির চাকাগুলো পুড়িয়ে নিজেদের গরম রাখছিল ওরা। শেষে আর অপেক্ষা করতে না পেরে বাবা জেম্স কিম সাহায্যের খোঁজে বেরিয়ে পড়েন। ভিজে জামাকাপড়ে হাইপোথার্মিয়া হয়ে কিছুক্ষণের মধ্যে মারা যান তিনি, অসহায় একা, অথচ ওনার পরিবারকে উদ্ধার করে পুলিশ। তৃতাদের অবশ্য টায়ার পোড়াতে হয়নি। গাড়িটা স্টার্ট হচ্ছে এখনও। পুলিশের উপদেশ মেনে চলাতে ব্যাটারি ডাউন হয়নি যদিও তেলের রেখা নেমে চলেছে। আরো কতদিন এইভাবে ওদের থাকতে হবে তা কে জানে। অমিতের উপর ওর রাগ রয়েছে ঠিকই কিন্তু তার মৃত্যু কামনা করছে না তৃতা।

খস খস শব্দ শুনে ফিরে তাকাল তৃতা। অমিত কাগজ পেন বার করেছে। তৃতা ওর দিকে তাকিয়ে রয়েছে দেখে বলল, 'মা বাবাকে চিঠি লিখছি। এই বিভীষিকা থেকে বেঁচে বেরোতে পারব বলে মনে হচ্ছে না। ওদের সঙ্গে আর কোনদিন দেখা হবে না। খুব খারাপ লাগছে বাবার সঙ্গে সেদিন মিছিমিছি ঝগড়া করলাম রুকির বিয়ের ব্যাপারটা নিয়ে। যার কাছে যা অপরাধ করেছি তার ক্ষমা চেয়ে নিলে অন্তত নিশ্চিন্তে মরতে পারব।'

কেমন একটা অদ্ভুত অনুভূতি হল তৃতার। অমিত তা হলে হাল ছেড়ে দিচ্ছে। অবশ্য ওদের কিছু করা নেই। তুষার ঝড় থেমেছে কিন্তু চারিদিকে বরফের চাদর ছাড়া কিছুই দেখা যাচ্ছে না। কোন ঘর বাড়ি না, রাস্তা না, কিছু না। কেবল সাদা আর সাদার দিগন্ত জোড়া ক্যানভাস। তার মাঝে পাতাহীন গাছগুলো খ্যাংড়া ঝাড়ুর মতন জেগে জেগে রয়েছে। ভারি সুন্দর লাগছে। মেলিসা হলে হয়তো নাওয়া খাওয়ার দুঃখ ভুলে ছবি আঁকতে বসে যেত। আগের তৃতা হলে হয়তো মনের পটে ছবি আঁকতে পারত কিন্তু এই নতুন তৃতার কিছুই মনে ধরছে না। ক্ষুধার রাজ্য তো বটেই অথচ পৃথিবী গদ্যময় হতে পারছে না কোনভাবেই। অমিত কিসব লিখে চলেছে। হঠাৎ তৃতার চোখের সামনে রিন্টির মুখটা ভেসে উঠল। ওর পিসুততো বোন রিন্টি। ঠাকুমার আচারের বয়াম থেকে আচার চুরি করে খেয়েছিল তৃতা আর রিন্টি বকুনি খেয়েছিল। সে বেচারা প্রতিবাদ করার চেষ্টা করেছিল কিন্তু কেউ বিশ্বাস করেনি যে ভাল মেয়ে তৃতা অমন কাজ করতে পারে। কাগজ পেন হাতে নিল তৃতাও। একে একে বাপ্পাদাকে তার আলমারি থেকে বই সরিয়ে নেয়ার জন্যে, অমৃতাকে প্রতীকের নামে মিথ্যা বলে তার সঙ্গে ঝগড়া লাগিয়ে দেওয়ার জন্যে ক্ষমা চাইল। দেবজ্যোতিকে ওকে বিয়ের প্রস্তাব রূঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করার জন্যে। দেবজ্যোতির তখন চাকরি নেই অথচ প্রেম করে বিয়ে করার শখ আছে, আর তৃতার কাছে অমিতের প্রস্তাব এসে গেছে। তাই সেটাকেই বেছে নিয়েছিল তৃতা। হয়তো যাদের উদ্দেশ্যে এই সব তারা কোনদিন সেগুলো পাবে না কিন্তু যে পাপের বোঝাগুলো মনের কোণে জমাট বেঁধেছিল সেগুলো ধীরে ধীরে গলে যাচ্ছে। অরিন্দম আর পৃথাকেও একটা চিঠি লিখতে হবে। তবে সবচেয়ে খারাপ লাগছে মা-বাবার কথা ভাবতে। ওদের সঙ্গে আর দেখা হবে না কোনদিন। তারা হয়তো ওর জন্যে কেঁদে কেঁদেই অসুস্থ হয়ে পড়বেন। গলা ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছে করছিল তৃতার অথচ কেঁদে কোন লাভই হবে না, কি অসহায় অবস্থা।

'অবন্তিকা মানসিক রোগী।'

অমিতের কথায় ওর দিকে চমকে তাকায় তৃতা।

'আমি এখনও ওইসব শুনতে চাই না?'

'না বললে আমি শান্তিতে মরতে পারব না। সেটা কি তুমি চাও?'

'শান্তির মৃত্যুর যোগ্য কি তুমি?

'সেটা ঘটনাটা শুনে বিচার করলে হয় না কি?'

আর কিছু বলেনি তৃতা।

'অবন্তিকার দুবার ডিভোর্স হয়ে গেছে অলরেডি। দ্বিতীয় বিচ্ছেদটা বেশ আঘাত দিয়েছে ওকে। আগে ও এই রকম ছিল না। ওই বিচ্ছেদটার পর থেকেই কি রকম জানি হয়ে যায়। দু'বার হাতের শিরা কেটে আত্মহত্যার চেষ্টা করেছে। পাগলামিতে ভর করলে যখন তখন যার তার সঙ্গে গায়ে হাত দিয়ে গলা জড়িয়ে কথা বলে। কোলে বসে পড়ে। সেটা আমাদের অফিসে একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু ওর কাজ ভাল। আট বছরের পুরনো রিসেপশানিস্ট সে, তাকে তো আর দুম করে ছাড়িয়েও দেওয়া যায় না। আমি ওকে সাইক্রিয়াটিস্টের কাছে নিয়ে গেছি বারদুয়েক। সেই রকমই একবার নিয়ে যাওয়ার সময় পারমিতাদি ফোন করে খাওয়ার নিমন্ত্রণ করেন। তখনই ওনাকে বলেছিলাম অবন্তিকাকে নিয়ে ডাক্তারের কাছে যাচ্ছি। উনি ভাল রকম জানেন তুমি অবন্তিকা নও, তাও কথাটা তোমার কানে তুলে দিতে ছাড়লেন না। তুমি খামোখা আজে বাজে চিন্তা করবে তাই তোমাকে মিথ্যা বললাম। তুমি আমাদের অফিসের জয়ন্ত, সুজিত বা মার্ক যে কাউকে জিজ্ঞেস করে দেখতে পার অবন্তিকা ওই রকমই করে সবার সঙ্গে। ঝপ করে কোলে বসে পড়ে, কাঁধে হাত দেয়– যেন ওর ভেঙে যাওয়া আত্মমর্যাদাকে গড়ে তোলার ওটাই উপায়। আমাদের খারাপ লাগে না সেটা। কোন রক্ত মাংসের পুরুষের ভাল লাগবে না? ও যে সুন্দরী বা ওর সঙ্গ যে পুরুষেরা পছন্দ করছে সেটা জোর করে প্রমাণ করতে চায় সে। আমি কৈফিয়ৎ দিচ্ছি না। সত্যটা তোমাকে বলছি শুধু। তুমি বিশ্বাস কর না কর সেটা তোমার ইচ্ছে। তবে ওর চাকরি আর বেশিদিন নেই। ওর জন্যে মার্চিং অর্ডার এল বলে।'

পাঁচ.

বরফে আটকে পড়ার চতুর্থ দিন সকালে রাশি রাশি বরফ সরিয়ে তৃতা আর অমিতকে উদ্ধার করেছিল পুলিশের লোকজন। ওরা দুজনেই তখন ঠাণ্ডায় এবং খিদের চোটে অচৈতন্য।

বার বার বরফ পরিষ্কার করতে গিয়ে অমিতের বাঁ হাতের দুটো আঙ্গুল ফ্রস্ট বাইটে হারিয়েছে। তৃতার কিছু হয়নি। হয়তো অমিত নিজে একটা কম্বল নিয়ে বাকিগুলো ওকে দিয়েছিল বলেই।

তৃতার আর সে যাত্রায় ভারতে ফেরা হয়নি। চিঠিগুলোও কাউকে পাঠানো হয়নি। তৃতা অবশ্য ঠিক করেছে যে পরের বার ভারতে গিয়ে তাদের সঙ্গে দেখা করে ক্ষমা চাইবে। অমিতের চেয়ে ওর লেখা চিঠির সংখ্যা অনেক বেশি ছিল। ভুল মানুষমাত্রই করে সেটা ভেবেই তৃতা রয়ে গেছে। জীবন যখন ওদের দ্বিতীয় সুযোগ দিয়েছে তখন সেটাকে দুই হাতে আঁকড়ে ধরাই মনে হয় বুদ্ধিমানের কাজ।

মেলিসা বলেছিল, 'লাইফ ইজ অল অ্যাবাউট সেকেন্ড চান্সেজ তৃতা। দেয়ার ইজ নো প্লেস ফর রিগ্রেট্স ইন ইট।'

সেটা মেনেই হয়তো তৃতা একদিন অমিতকে ক্ষমা করে দিতে পারবে!

অনন্যা দাশ
প্রবাসী ভারতীয় কথাসাহিত্যিক

Coca-Cola
খোলো খুশির জোয়ার!

প্রবন্ধ

ভগবতী দেবী

বিদ্যাসাগরজননী

সরস্বতী রানী পাল

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে মহাত্মা রামমোহন, ডেভিড হেয়ার, রামকমল, রাধাকান্ত প্রমুখ যে কর্মক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিলেন; সেই কর্মক্ষেত্রে কাজ করার জন্য অলৌকিক পৌরুষ ও প্রতিভা, অসাধারণ অধ্যবসায় ও সহিষ্ণুতা, দয়া এবং প্রেমের প্রতিমূর্তিরূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (২৬ সেপ্টেম্বর, ১৮২০ - ২৯ জুলাই, ১৮৯১) মেদিনীপুরের বীরসিংহ গ্রামের দরিদ্র ব্রাহ্মণ ঠাকুরদাসের পর্ণকুটীরে পুণ্যশীলা ভগবতী দেবীর কোলে।

ঠাকুরদাস-ভগবতী দম্পতির সাত পুত্র ও তিন কন্যা। পুত্রগণের নাম ঈশ্বরচন্দ্র, দীনবন্ধু, শম্ভুচন্দ্র, হরচন্দ্র, হরিশচন্দ্র, ঈশানচন্দ্র ও ভূতনাথ। তিন কন্যার নাম মনোমোহিনী, দিগম্বরী ও মন্দাকিনী।

বাংলা সাহিত্যে ও সমাজে 'ঈশ্বরচন্দ্র' নামটি যেমন মহৎ ও বিদ্বান তেমন উদার মনের নমস্য বাঙালিও। তাঁর প্রকৃত নাম ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, 'বিদ্যাসাগর' তাঁর উপাধি। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্বান ও বিদ্যা বিতরণে নিবেদিত মানুষ হিসেবে এমনই খ্যাতিমান হয়েছেন যে, এই উপাধি তাঁরই একচেটিয়া হয়ে উঠেছে। ঈশ্বরচন্দ্র ১২ বছর কাব্য, ব্যাকরণ, অলঙ্কার, বেদান্ত, স্মৃতি, ন্যায় ও জ্যোতিষ শাস্ত্রে অসাধারণ পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। ১৮৩৯ সালে এসব বিষয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার পর 'বিদ্যাসাগর' উপাধি লাভ করেন। তাকে বাংলা গদ্যের জনক বলা হয়। ১৮৪১ সালে তিনি ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে বাংলা বিভাগের হেড পণ্ডিতের পদ লাভ করেন। তিনি ছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। কোন কারণেই আপস না করা ছিল বিদ্যাসাগরের কঠোর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। তাঁর সম্পর্কে গান্ধীজী বলেছিলেন, 'আমি যে দরিদ্র বাঙালি ব্রাহ্মণকে শ্রদ্ধা করি, তিনি হলেন বিদ্যাসাগর।'

পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে যুগে যুগে যে-সব মহামানবের উদ্ভব হয়েছে তাঁদের অলৌকিক জীবনের কার্যাবলীর পিছনে রয়েছে তাঁদের জননীদের প্রভাব ও প্রতিপত্তি। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জননীদের জীবনালেখ্য উপেক্ষিতই থাকে। তেমনি বিদ্যাসাগরজননী ভগবতী দেবীর কথাও অতি অল্প লোকেই জানেন। তাঁর পিতামহ ছিলেন সত্যসন্ধ, ধর্মনিষ্ঠ, সাত্ত্বিক প্রকৃতির লোক। পিতা মহাত্মা রামকান্ত তর্কবাগীশ জাহানাবাদ মহকুমার পশ্চিমে সুপ্রসিদ্ধ গোঘাট গ্রামে বাস করতেন। ইনি পাতুলগ্রামনিবাসী অদ্বিতীয় পণ্ডিত পঞ্চানন বিদ্যাবাগীশের জ্যেষ্ঠাকন্যা গঙ্গামণি দেবীর পাণিগ্রহণ করেন। তাঁর গর্ভেই রামকান্তের লক্ষ্মী ও ভগবতী নামে পরম সুলক্ষণা দুই কন্যা জন্মে।

ভগবতী দেবী শৈশবে মাতুলালয়ে লালিত-পালিত হয়েছিলেন। বাল্যকালে তাঁর কোন অধীত বিদ্যালাভ হয়নি। স্ত্রীলোকদের শিক্ষা দিলে সমাজের অনিষ্ট হবে, স্ত্রীলোকেরা স্বামীকে ভক্তি করবে না, গৃহকর্মে উপেক্ষা করবে, স্ত্রীজনোচিত লজ্জা ও ধীরতার জলাঞ্জলি দিয়ে প্রগলভা ও অশান্ত প্রকৃতির হবে, সে-কালে এরূপ অনিষ্টপাতের আশঙ্কা সকলেই করতেন। নারীর অধীত বিদ্যা শিক্ষা দেওয়ার প্রণালী তখন ছিল লোকচিন্তার অতীত। কিন্তু মাতুলালয়ে আদর্শ হিন্দু পরিবারে প্রতিদিন যে ধর্মকর্মের অনুষ্ঠানাদি ও যে জ্বলন্ত আদর্শ বিদ্যমান ছিল, তার ফলে তাঁর যে কোন শিক্ষালাভ হয়নি, একথা বলা যায় না। কারণ, ইন্দ্রিয়, মস্তিষ্ক ও হৃদয়ের পূর্ণতা লাভই শিক্ষা; আর চক্ষু কর্ণাদি ইন্দ্রিয়গণের উপযুক্ত ব্যবহার ও বিষয় পরিচালনাই যথার্থ শিক্ষা। আদর্শ হিন্দুগৃহের কার্যকলাপ, রীতিনীতি, ভাবভক্তি চরিত্রগঠনের প্রধানতম উপাদান হয়েছিল। তাই উত্তরকালে ভগবতী দেবীর গর্ভে বঙ্গের যে বিরাট মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করেছিলেন, তাঁর অলৌকিক লোকসেবার মন্দাকিনীধারা বেগবান হয়েছিল মায়ের চরিত্র থেকেই।

আত্মচরিতে বিদ্যাসাগর তাঁর মাতুলালয়ের যে উজ্জ্বল চিত্র অঙ্কন করেছেন, যে হৃদয়স্পর্শী বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন, তা থেকে সকলে অবগত হতে পারবেন, কিভাবে হিন্দু একান্নবর্তী পরিবার গার্হস্থ্যধর্ম প্রতিপালন করে আত্মীয়-স্বজন ও সমাজের প্রভূত কল্যাণসাধন করতেন। সুশীলতা, ভব্যতা, ঔদার্য্য, বিনয় শিষ্টাচার ও সৌজন্য প্রভৃতি সদ্‌গুণ যে সামাজিক বন্ধনের প্রধান উপায়, এ শিক্ষার বীজ তাঁর বাল্যহৃদয়েই অঙ্কুরিত হয়েছিল।

১৮১৩ খ্রিস্টাব্দে হুগলী জেলার অন্তর্বর্তী বনমালিপুর গ্রামের ভুবনেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পৌত্র এবং রামজয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠপুত্র ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে ভগবতী দেবীর বিবাহ হয়। তখন ঠাকুরদাসের বয়ঃক্রম তেইশ কি চব্বিশ বৎসর; ভগবতী দেবী নবম বর্ষে পদার্পণ করেছেন। ভগবতী দেবী যৌবনসীমায় পদার্পণ করার পূর্বেই শ্বশুরালয়ে আগমন করেন। মাতুলালয়ের সচ্ছল সংসারের সুখ-সচ্ছলতা আর তাঁর মনকে পরিতৃপ্ত করতে পারে না। তিনি স্বামীর আত্মসম্মানকে মূল্যবান মনে করে সন্তুষ্টচিত্রে মাতুলগৃহ ত্যাগ করে স্বামীগৃহে নিতান্ত সাংসারিক অসচ্ছলতার মধ্যে বাস করেও সুখে দিনযাপন করতে লাগলেন। তিনি অনন্যমনে স্বামীর চিত্তানুবর্তন করতেন, প্রত্যহ স্বহস্তে গৃহমার্জনা, মৃত্তিকা দ্বারা উপলেপন, গৃহোপকরণ-ভোজন পাত্রাদির সংস্কার, রন্ধন, যথাসময়ে ভোগ্যসামগ্রীর দান ও সাবধানে সমস্ত দ্রব্য রক্ষা করতেন। তিরস্কার বাক্য কখনও মুখে আনতেন না। গুরুজনের নিকটে উচ্চ আসনে উপবেশন বা উচ্চকথা বলতেন না। শ্বশুর ও শ্বশ্রূজনের প্রতি ভক্তি দেখাতেন; দেবর, ননদের প্রতি মায়া মমতা প্রদর্শন এবং পরিবারস্থ লোকদের বিনম্র ব্যবহারে পরিতুষ্ট করতেন। তিনি অতি অল্প বয়সেই সমুদয় সুগৃহিণীর ধর্ম

বিদ্যাসাগরজননী ভগবতী দেবীর জীবনালেখ্য তাঁর মহান পুত্র ঈশ্বরচন্দ্রের কীর্তিকথার মধ্যেই পাওয়া যায়। ঈশ্বরচন্দ্র যখন মাতৃগর্ভে ছিলেন, তখন ভগবতী দেবী দশ মাস উন্মত্তার ন্যায় ছিলেন। সেসময়ে পণ্ডিতপ্রবর ভবানন্দ শিরোমণি ভট্টাচার্য বলেছিলেন, ‘ ইঁহার কোন রোগ নাই; ঈশ্বরানুগৃহীত কোন মহাপুরুষ ইঁহার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছেন... গর্ভস্থ বালক ভূমিষ্ঠ হইলেই ইনি রোগমুক্ত হইবেন।’

অবগত হয়েছিলেন। পল্লীর সমবয়স্কা রমণীগণ তাঁর সদ্ব্যবহারে ও স্নেহে এতদূর মুগ্ধ হয়েছিলেন যে, প্রত্যেকে মনে করতেন তিনি তাকেই অধিক ভালবাসেন। তিনি তাঁদের সুখ-দুঃখের একান্ত সঙ্গী ছিলেন।

ভগবতী দেবী ও ঠাকুরদাসের দাম্পত্য প্রেম অতীব মধুর ছিল। ঠাকুরদাস ও ভগবতী দেবীর হৃদয়ে দাম্পত্য প্রেম যে কালের আবর্তনে পরিপক্বতা প্রাপ্ত হয়ে স্নেহরসে পরিণত হয়েছিল, পরস্পরকে প্রীতিসম্পন্ন করেছিল, তাতে অণুমাত্র সন্দেহ নেই। ভগবতী দেবী সংসার সাধনকেই ধর্মসাধন মনে করতেন। পারিবারিক ধর্মের মধ্যে স্ত্রীজাতির সতীত্বধর্ম সর্বশ্রেষ্ঠ। যেমন গন্ধবিহীন পুষ্প, বিনয়বিহীন ধার্মিক, মীনহীন সরোবর ও তরুহীন জনপদ অনুশোচ্য; সতীত্ববিহীন রমণীও ততোধিক অনুশোচ্য। সকল ব্রত অপেক্ষা পাতিব্রত শ্রেষ্ঠ। ভগবতী দেবী আজীবন ঠাকুরদাসের সুখ-দুঃখের সঙ্গিনী ছিলেন। দুঃখে কষ্টে ভগবতী যখন ঠাকুরদাসের পাশে থেকে তাঁকে মধুর বাক্যে সান্ত্বনা দিতেন, তখন ঠাকুরদাস মনে করতেন, তিনি যেন ইহজগতের জীব নন; তাঁর পাশে কোন দেবীমূর্তি অধিষ্ঠিত হয়ে তাঁর মঙ্গল কামনায় নিরত রয়েছেন।

বিদ্যাসাগরজননী ভগবতী দেবীর জীবনালেখ্য তাঁর মহান পুত্র ঈশ্বরচন্দ্রের কীর্তিকথার মধ্যেই পাওয়া যায়। জানা যায়, ঈশ্বরচন্দ্র যখন মাতৃগর্ভে ছিলেন, তখন ভগবতী দেবী দশ মাস উন্মত্তার ন্যায় ছিলেন। সেসময়ে উদয়গঞ্জনিবাসী পণ্ডিতপ্রবর ভবানন্দ শিরোমণি ভট্টাচার্য চিকিৎসা ও গণিতশাস্ত্রে পারদর্শী ছিলেন। রোগের তথ্যানুসন্ধান বিষয়ে তাঁর বিশেষ ক্ষমতা ছিল। তিনি রোগনির্ণয়ের পূর্বে রোগীর কোষ্ঠী গণনা করতেন। ভবানন্দ গণনা করে বলেন, ‘ইঁহার কোন রোগ নাই; ঈশ্বরানুগৃহীত কোন মহাপুরুষ ইঁহার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছেন, তাঁর তেজঃপ্রভাবে এরূপ হচ্ছে, কোনরূপ ঔষধ সেবন করাইবেন না। গর্ভস্থ বালক ভূমিষ্ঠ হইলেই ইনি রোগমুক্ত হইবেন।’ সত্যিই তাই হল, প্রসবের পরক্ষণেই ভগবতী দেবীর উন্মাদচিহ্ন তিরোহিত হয়।

ঈশ্বরচন্দ্র ভূমিষ্ঠ হওয়ার কিছুক্ষণ পূর্বে ঠাকুরদাস দ্রব্যাদি ক্রয় করার জন্য নিকটবর্তী কুমারগঞ্জের হাটে গিয়েছিলেন। সেখান থেকে আসার সময় রামজয় কিছু অগ্রসর হয়ে জানালেন, ‘ঠাকুরদাস, অদ্য আমাদের একটি এঁড়ে বাছুর হইয়াছে।’ তৎকালে গৃহে একটি গাভীও গর্ভিণী হয়েছিল। ঠাকুরদাস মনে করলেন, গর্ভবতী গাভীটি প্রসব করেছে। তিনি বাড়ি এসে গোশালায় গমন করলেন কিন্তু দেখলেন গাভী প্রসব করেনি। তখন রামজয় ঈষৎ হাস্যবদনে সূতিকাগৃহে প্রবেশ করে ঈশ্বরচন্দ্রকে দেখিয়ে বললেন, ‘এছেলে এঁড়ের মত বড় একগুঁয়ে হইবে। ইহার প্রতিজ্ঞা হিমাদ্রির ন্যায় অটল অচল রহিবে এবং প্রতিজ্ঞার পরাক্রমে চতুর্দিক কম্পিত হবে, একারণ এঁড়ে বাছুর বলিলাম। এর দ্বারা উত্তরকালে দেশের বিশেষরূপ উপকার হইবে।’

দিবা প্রহরে বীরশিশু ঈশ্বরচন্দ্র বীরসিংহ ক্ষুদ্র পল্লীতে দরিদ্র ঠাকুরদাসের পর্ণকুটিরে ভূমিষ্ঠ হলে সূতিকাগৃহের দ্বারে সমাগত পল্লীবাসীগণের মাঙ্গল্য শঙ্খধ্বনি ও হুলুধ্বনিতে ক্ষুদ্র পল্লীখানি মুখরিত হয়। একপ্রকার মাঙ্গল্য অভ্যর্থনার মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্র প্রথম সূর্যের আলোক দেখতে পান। তীর্থক্ষেত্র হতে সমাগত পিতামহ রামজয় বন্দ্যোপাধ্যায় নাড়ীচ্ছেদনের আগে আল্‌তার দ্বারা ভূমিষ্ট বালকের জিহ্বার নিম্নে কয়েকটি কথা লিখে তাঁর পত্নী দুর্গাদেবীকে বললেন– ‘লেখার নিমিত্ত শিশুটি কিয়ৎক্ষণ মাতৃদুগ্ধ পান করতে পায় নাই; বিশেষত কোমল জিহ্বায় আমার কঠোর হস্ত দেওয়ায়, এই বালক কিছুদিন তোতলা হইবে। এই বালক ক্ষণজন্মা, অদ্বিতীয় পুরুষ ও পরম দয়ালু এবং এর কীর্তি দিগন্তব্যাপিনী হইবে। এই বালক জন্মগ্রহণ করায় আমার বংশের চিরস্থায়ী কীর্তি থাকিবে। একে দেখে আমি চরিতার্থ হইলাম। এই বালককে অপর কেহ যেন মন্ত্র না দেয়; অদ্য হতে আমিই এর অভীষ্টদেব হইলাম। এ বালক সাক্ষাৎ ঈশ্বরতুল্য; অতএব এর নাম অদ্য হতে আমি ঈশ্বর রাখিলাম।’ সূতিকাগৃহে পিতামহ যে নামে তাঁকে অভিহিত করেছিলেন, সেই ‘ঈশ্বরচন্দ্র’ নামেই তিনি উত্তরকালে জনসমাজে পরিচিত হয়েছেন।

ঈশ্বরচন্দ্রের ভূমিষ্ঠ হওয়ার কিছুক্ষণ পরে গ্রহবিপ্রশ্রেষ্ঠ কেনারাম আচার্য্য বালকের ঠিকুজী প্রস্তুত করার সময় ফল বিচার করে বিস্মিত হন। আচার্য্য কোষ্ঠী গণনা করে বলেন– ‘এই বালক ক্ষণজন্মা; উচ্চ গ্রহসকল প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান হইতেছে, এরূপ ফল কাহারও কোষ্ঠীতে অদ্যাপি দেখতে পাই নাই। এ বালক জগদ্বিখ্যাত নৃপতুল্য ও দয়াময় হইবে এবং দীর্ঘায়ু হইয়া নিরন্তর ধন ও বিদ্যাদান করিয়া, সাধারণের দুঃখনিবারণ করিবে।’

শিশু বিদ্যাসাগর সকলের অগোচরে জননীর স্নেহময় বক্ষে শুক্লপক্ষের শশিকলার ন্যায় অনুদিন বর্দ্ধিত হতে লাগলেন। তখন দেশে স্ত্রীশিক্ষার প্রচলন ছিল না। কারণ, বহু শতাব্দী ধরে ভারতে স্ত্রীজাতি অজ্ঞানান্ধকারে নিমজ্জিত ছিলেন। তখনকার জননীগণ রত্নাকরের মুক্তি, হরিশ্চন্দ্রের স্বার্থত্যাগ, যুধিষ্ঠিরের ন্যায়নিষ্ঠা, ভীষ্মের শরশয্যায় শয়ন, অর্জুনের রণকৌশল ও বাহুবল, রামচন্দ্রের পিতৃভক্তি, ভ্রাতৃবৎসলতা, লোকরঞ্জনের জন্য স্বার্থত্যাগ, লক্ষ্মণের অগ্রজানুরাগ, সতী সাবিত্রীর পতিভক্তি প্রভৃতি উপাখ্যানগুলি সন্তানশিক্ষার প্রকৃষ্ট উপাদান বলে মনে করতেন। তখনকার সন্তানগণ মাতা, মাতামহী, পিতামহী প্রভৃতির মুখের অন্নে অভ্যাগণের পরিচর্যা, অপরিচিত রুগ্ন ব্যক্তির সেবা শুশ্রূষা, বিপন্নকে আশ্রয়দান, ক্ষুধাতুরকে অন্নদান করতে দেখে পরোপকার ও সেবাধর্ম শিক্ষা করত। এরূপে তারা দয়াশীল, হৃদয়বান ও মিষ্টভাষী হতে শিক্ষা পেত। আদর্শপরিবারে বার মাসে তের পার্বণ ছিল, ধর্মানুষ্ঠান ছিল, তাই গৃহের সর্ববিধ কর্মের মধ্যে দিয়েই সন্তানগণ সুশিক্ষা লাভ করত।

সেকালে পাঠশালায় শিশুদের বিদ্যাশিক্ষা আরম্ভ হত। পাঠশালে পাঠদানের রীতি ছিল যে, বালকেরা প্রথমে মাটিতে খড়ি দিয়ে বর্ণপরিচয় করত। তারপর তালপত্রে, স্বরবর্ণ, ব্যঞ্জণবর্ণ, যুক্তবর্ণ, শতকিয়া, কড়াকিয়া, বুড়িকিয়া প্রভৃতি লিখত। শেষে তালপত্র হতে কদলীপত্রে উন্নীত হত। তখন তেরিজ, জমাখরচ, শুভঙ্করী, কাঠাকালী, বিঘাকালী প্রভৃতি শিখত। সর্বশেষে কাগজে উন্নীত হয়ে চিঠিপত্র লিখতে শিখত। পাঁচ বছর বয়সে বিদ্যাসাগরের বিদ্যারম্ভ হয়। সেকালে বীরসিংহ গ্রামে সনাতন বিশ্বাস ছিলেন পাঠশালার সরকার। ঠাকুরদাস বীরসিংহ নিবাসী কালীকান্ত চট্টোপাধ্যায়কে শিক্ষক মনোনীত করলেন। কালীকান্ত শিশুগদের শিক্ষা দেবার বিশেষ প্রণালী জানতেন এবং তাদের আন্তরিক যত্ন ও স্নেহ করতেন। কালীকান্তের কাছে বিদ্যাসাগর তিন বছর ক্রমাগত শিক্ষা করে বাঙলা ভাষা ও সামান্য অঙ্ক করতে শিখলেন। তিনি আপন সন্তান অপেক্ষাও বিদ্যাসাগরকে অধিক ভালবাসতেন। গুরুমহাশয় একদিন সন্ধ্যার সময় ঠাকুরদাসকে বললেন, ‘মহাশয়, আপনার পুত্র অদ্বিতীয় বুদ্ধিমান, শ্রুতিধর বললেও অত্যুক্তি হয় না। পাঠশালায় যা শিখতে হয়, তার সমুদয়ই এর শিক্ষা হয়েছে। আপনি নিকটে রাখিয়া ইংরাজি শিক্ষা দিলে ভাল হয়। এ ছেলে সামান্য ছেলে নয়, বড় বড় ছেলেদের অপেক্ষা ইহার শিক্ষা অতি উত্তম হইয়াছে। আর হস্তাক্ষর যেরূপ হইয়াছে, তাহাতে পুঁথি লিখিতে পারিবে।’

বিদ্যাসাগর বাল্যকালে অতিশয় দুষ্ট ছিলেন। শ্রীচৈতন্য বাল্যকালে গঙ্গাতীরে ব্রাহ্মণগণের নৈবেদ্য কেড়ে খেতেন। ইংরেজ কবি শেকস্‌পিয়ার বাল্যকালে দুষ্ট বালকদের সঙ্গদোষে হরিণ চুরি করেছিলেন। কবি ওয়ার্ডস্‌ ওয়ার্থের অত্যাচারে তাঁর জননী জ্বালাতন হতেন। আর বালক বিদ্যাসাগর বাল্যকালে পাড়ার লোকের বাগানের ফল পেড়ে খেতেন; কেউ কাপড় শুকাতে দিয়েছে দেখলে, তার উপর মলমূত্র ত্যাগ করতেন। এই সব অপকর্মের কথা মায়ের কানে গেলে তিনি বিদ্যাসাগরকে বললেন– 'বাপু তুমি লোকের ছেঁড়া কাপড় পরিয়া বাটিতে আইস, লোকের দুঃখ দেখিলে তুমি মনে এত দুঃখ পাও, আর এরূপ করিয়া লোকের মনে ব্যথা দাও কেন? কোন খাদ্যদ্রব্য হস্তে তাহারা তোমার বিষ্ঠা স্পর্শ করিলে, সেই দ্রব্যগুলি তাহাদিগকে ফেলিয়া দিতে হয়, পুনরায় স্নান করিতে হয়। আহা, তাহাদের কত কষ্ট দেখ দেখি।' বালক বিদ্যাসাগর বালসুলভ চপলতাবশত এসব করতেন। কিন্তু যে দিন মাতার সুশিক্ষায় বুঝতে পারলেন, ঐ সকল অন্যায় কাজের জন্য লোকে নিগ্রহ ভোগ করে, তাদের মনে কষ্ট দেওয়া হয়, সেই দিন থেকেই তিনি ঐরূপ অন্যায় কাজ করতে বিরত হন।

বিদ্যাসাগর অতিশয় একগুঁয়েও ছিলেন। এজন্য পিতা ঠাকুরদাস তাঁকে প্রহার পর্যন্ত করতেন, এবং তাঁর নাম রেখেছিলেন– 'ঘাড় কেঁদো'। কিন্তু ভগবতী দেবী হৃদয়ের স্নেহ-মমতা দিয়ে তাঁকে সংযত করতে চেষ্টা করতেন। তিনি যেন জানতেন, প্রগাঢ় সন্তানবাৎসল্যই শিশুকে একান্ত আপনার করে তোলে। ভগবতী দেবী বলতেন, 'সন্তান বালবুদ্ধিবশত কোন অন্যায় কার্য্য করিলে পর, মাতা যদি মুখ আঁধার করিয়া তাহার সহিত কিছুক্ষণ আলাপ বন্ধ রাখেন, আর সন্তান মাতাকে প্রসন্ন করিবার জন্য তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিয়া না বেড়ায়, তাহা হইলে, সে মাতাই বা কিরূপ, তাঁহার ভালবাসাই বা কিরূপ, আর তাঁহার মায়া-মমতাই বা কিরূপ, কিছুই ত বুঝিতে পারিলাম না।'

ভগবতী দেবীর চরিত্রের এক বিশেষত্ব দেখতে পাওয়া যায় যে, তিনি অসত্যকে সত্যরূপে প্রতীয়মান করতে অতিশয় ঘৃণা বোধ করতেন। অনেক জননীকে এরূপ দেখা যায় যে, রোরুদ্যমান শিশু সন্তানগণকে শান্ত করার জন্য কিংবা অবাধ্য সন্তানদের বাধ্য করার অভিপ্রায়ে তাঁরা তাদের 'জুজুর ভয়' দেখিয়ে থাকেন। এরূপ ভয় প্রদর্শন যে সন্তানের পক্ষে মহা অনিষ্টের কারণ, সে বিষয়ে কোন সংশয় নেই। এর ফলে শিশুর বল, বিক্রম ও আত্মরক্ষার ভাব– সবই বিনষ্ট হয়ে যায়। কোন কোন জননীকে দেখা যায় যে, শিশু যদি তার প্রিয় বস্তু পাওয়ার জন্য ক্রন্দন করে, তবে তাকে 'আকাশের চাঁদ' প্রভৃতির প্রলোভন দেখিয়ে শান্ত করেন। এরূপ ব্যবহারে শিশুরা অতি সহজেই অন্যকে অবিশ্বাস করতে শিক্ষা করে এবং ধীরে ধীরে মিথ্যা, শঠতা, প্রবঞ্চনা প্রভৃতি তাদের সুকোমল বাল্যহৃদয়ে প্রবেশ লাভ করে কালক্রমে বদ্ধমূল হতে থাকে। ভগবতী দেবী সন্তানদের কখন 'জুজুর ভয়' দেখানো কিংবা তাদের শান্ত করার মানসে 'আকাশের চাঁদ ধরে দেওয়ার কথা বলতেন না। তিনি এরূপ ক্ষেত্রে সন্তানের যতদূর সম্ভব প্রার্থনা রক্ষা করতেন এবং স্নেহ-মমতা দিয়ে তাদের শান্ত করতেন। কঠোর শাসনে তাদের কোমল বৃত্তিগুলির মূলে আঘাত করার চেষ্টা তিনি কখনই করেননি। এটি তাঁর কাছে একেবারেই প্রকৃতিবিরুদ্ধ ছিল। অবস্থায় যা সঙ্কুলান হয় তার অতিরিক্ত প্রার্থনা করলে, সংসারের দরিদ্র অবস্থা স্মরণ করে এবং বুঝিয়ে তাদের নিরস্ত করতেন। স্নেহ-ভালবাসা বর্জিত কঠোর শাসন যে কোমলমতি শিশুর পক্ষে অতীব অনিষ্টকর, তা তিনি বিলক্ষণ বুঝতেন। কঠোর শাসনে শিশু দিনদিন উৎসাহ হারিয়ে ফেলে– আলস্য, ভীরুতা ও শঠতা এসে তাকে আশ্রয় করে। কোন কোন মা আছেন, যারা সন্তানের সামান্য অপরাধ উপেক্ষা করেন, এটা খুবই অন্যায়। প্রদীপে একবার হাত দিয়ে যন্ত্রণা অনুভব করলে শিশু আর কখনও প্রদীপে হাত দিতে যাবে না। এরকম ক্ষেত্রে, মায়ের গুরুতর শাসনের প্রয়োজন হয় না। হয়তো কোন সন্তানের অসাবধানতাবশত তার হস্তপদ ভগ্ন হয়েছে, এরকম ক্ষেত্রে মায়ের সন্তানের জীবন রক্ষার উপায় বিধান করাই বিধেয় কিন্তু এমন অনেক নির্মম মা আছেন যে, তাঁরা সেই সময়ে ক্রোধপরবশ হয়ে সন্তানকে ভয়ানক তিরস্কার করতে আরম্ভ করেন; উপস্থিত কর্তব্যের বিষয় একেবারে বিস্মৃত হন। ভগবতী দেবীর প্রকৃতি এমন ছিল না। বালক বিদ্যাসাগর একবার ধানখেতের পাশ দিয়ে যাবার সময় ধানের শীষ তুলে চিবাতে চিবাতে যান। শেষে ধানের শীষের শুঁয়া গলায় আটকিয়ে প্রাণসংশয় হয়ে ওঠে। বাড়িতে আনা হলে তাঁর পিতামহী অতি কষ্টে সেই শুঁয়া বের করে দেন এবং সে যাত্রায় বিদ্যাসাগরের প্রাণরক্ষা হয়। ভগবতী দেবী সেই সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় যেন সন্তান বিপদমুক্ত হয়, প্রথমত, তারই সহায়তা সর্বোতভাবে করে শেষে শিক্ষা দিলেন– 'বাবা, অমুক অমুক শস্যের শীষে শুঁয়া আছে, আর কখন এই সব শস্যের শীষ চিবাইও না।' তিনি জানতেন, এই ভুলটাই একটা মহা শিক্ষা।

শিশু যেরূপ পরিবার মধ্যে থেকে লালিত-পালিত হয়, তার শিক্ষা ও চিত্তবৃত্তির বিকাশও যে তদনুরূপ হবে, সে বিষয়ে কোন সংশয় নেই। সৎকাজে উৎসাহ দান ভগবতী দেবীর চরিত্রের আরেক বিশেষত্ব। শিশু সন্তানদের সৎকাজ ও সদ্ব্যবহার দেখলে ভগবতী দেবী আনন্দিত হতেন এবং উৎসাহ দিতেন। একদা বালক বিদ্যাসাগর সমবয়স্ক বালকদের সঙ্গে খেলা করছিলেন। খেলাশেষে দেখতে পেলেন একজন সঙ্গী ছিন্নবস্ত্র পরিধান করে আছে। তিনি তাকে নিজের বস্ত্রখানি দিয়ে স্বয়ং তার ছিন্নবস্ত্রখানি পরিধান করলেন। বাড়ি এলে মা জিজ্ঞাসা করায় বালক সত্য ঘটনাটি প্রকাশ করলেন। মা সন্তুষ্ট হয়ে বললেন, 'এই ত ভাল ছেলের কাজ; আমি চরকায় সূতা কাটিয়া তোমার আর একখানি নূতন কাপড় প্রস্তুত করাইয়া দিব।' সন্তানদের এধরনের সদানুষ্ঠান বা পরোপকার বৃত্তি দেখলে তাদের প্রতি আদর ও সস্নেহ ভাব প্রদর্শন করা তিনি অবশ্য-কর্তব্য বলে মনে করতেন।

স্নেহময়ী মায়ের অধরনিঃসৃত সুমিষ্ট অনুশাসনবাক্য সন্তানের স্মৃতিপটে নিবদ্ধ হয়ে থাকে। বিদ্যালয়ের শত শিক্ষকের উপদেশে যে শিক্ষা লাভ হয় না, একজন সুশিক্ষিতা, সচ্চরিত্রা, সংযতচিত্তা, বিবেকপরায়ণা মাতার ক্রোড়ে বর্ধিত হলে, সন্তানদের সে বিষয়ে শিক্ষা লাভ হয়ে থাকে। মহৎ লোকের জীবনচরিত্র পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, জগতে যত মহাজন যে যে সদ্‌গুণের জন্য প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন, অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, তাঁদের জননীগণ এসব চরিত্রগুণে গুণবতী ছিলেন। সন্তানের ওপর মায়ের প্রভাব যে অতি গুরুতর এবং মায়ের ধর্মশীলতা, আত্মসংযম ও সহিষ্ণুতা প্রভৃতি সদ্‌গুণের উপর যে সন্তানের ও সমাজের ভাবী শুভাশুভ সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। জননীর সাধুতা ও ধর্মনিষ্ঠার কথা স্মরণ করে সন্তান অধর্ম পথ ত্যাগ করেছে, অনুতাপের অশ্রু বিসর্জন করে পাপের প্রায়শ্চিত করেছে, এমন দৃষ্টান্তের অভাব নেই।

১৮২৯ সালে ঠাকুরদাস ঈশ্বরচন্দ্র ও গুরু কালীকান্ত চট্টোপাধ্যায়কে নিয়ে কলকাতা যাত্রা করেন। কলকাতা বীরসিংহ গ্রাম থেকে প্রায় ২৬ ক্রোশ উত্তর-পূর্বে। ঈশ্বরচন্দ্র সমস্ত রাস্তা চলতে পারবে না বলে, ভৃত্য আনন্দরাম গুটিকে ঠাকুরদাস সঙ্গে নিয়েছিলেন। প্রথম দিন বাড়ি থেকে ৬ ক্রোশ দূরে পাতুল গ্রামে রাধামোহন বিদ্যাভূষণের বাড়িতে উপস্থিত হলেন। পরদিন ১০ ক্রোশ দূরে সন্ধিপুর গ্রামে রাজচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বাড়িতে আগমন করলেন। পরদিন শ্যাখালা গ্রামের প্রান্তভাগে যে বাঁধা রাজপথ শালিকা পর্যন্ত গিয়েছে, সেই পথ দিয়ে গমনকালে ঈশ্বরচন্দ্র মাইল-স্টোন দেখে বললেন, 'বাবা! হলুদ বাটিবার শিল এখানে কেন মাটিতে পোতা হইয়াছে। আর ইহাতে কি লেখা আছে?' ঠাকুরদাস বললেন, 'ইহাকে মাইল-স্টোন বলে। ইহাতে ইংরাজী ভাষার নম্বর লেখা আছে। এক মাইল (অর্ধ ক্রোশ) অন্তর এক একটি এইরূপ পাথর পোতা আছে।'

শ্যাখালা হতে শালিকার ঘাট পর্যন্ত এইরূপ মাইল-স্টোনে ইংরেজি অঙ্ক দেখে ঈশ্বরচন্দ্র ১ থেকে ১০ পর্যন্ত চিনলেন। কালীকান্ত ও ঠাকুরদাস পথিমধ্যে জগদীশপুরে যে স্থানে মাইল-স্টোন ছিল, ঈশ্বরচন্দ্র অক্ষর চিনতে পেরেছেন কি না জানার অভিপ্রায়ে যুক্তি করে সেই স্থান দেখাননি। বিদ্যাসাগর বললেন, 'ইহার পূর্বে তবে একটা পাথর আমরা দেখিতে বিস্মৃত হইয়াছি।' কালীকান্ত বললেন, 'ঈশ্বর, তুমি ইংরাজি সংখ্যা চিনিয়াছ কি না জানিবার জন্য আমরা ঐরূপ করিয়াছি। তুমি যে বলিতে পারিলে, তাহাতে আমরা পরম আহ্লাদিত হইলাম।'

ঠাকুরদাসের পূর্বপুরুষগণ সকলেই সংস্কৃত অধ্যয়ন করে বিদ্যাদান করেছেন। কেবল তাঁকে দুর্ভাগ্যপ্রযুক্ত বাল্যকাল থেকে সংসার প্রতিপালনের জন্য আশু অর্থকরী ইংরেজি বিদ্যাশিক্ষা করতে হয়েছে। তাঁর ইচ্ছা ছিল, ঈশ্বর সংস্কৃত অধ্যয়ন করলে দেশে টোল করে দেবেন। তাই ঠাকুরদাস ঈশ্বরচন্দ্রকে কলিকাতাস্থ পটলডাঙ্গা গভর্নমেন্ট সংস্কৃত কলেজে ব্যাকরণের তৃতীয় শ্রেণীতে ভর্তি করে দিলেন। বাঙালির সৌভাগ্য যে, ঈশ্বরচন্দ্র

বঙ্গভাষার জননী সংস্কৃত ভাষার সেবার নিমিত্ত সংস্কৃত কলেজে ভর্তি হয়েছিলেন। তিনি ছাড়া আর কে মাতৃভাষার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করতে পারতেন? তিনি সযত্নে ও পরিশ্রমে যে মাতৃভাষাতরু রোপণ করে গিয়েছিলেন, তাতে অক্ষয়কুমার, বঙ্কিমচন্দ্র, কালীপ্রসন্ন, মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র প্রভৃতি বঙ্গজননীর কৃতী সন্তানগণ যত্নসহকারে প্রতিভাবারি সিঞ্চন করেছেন বলেই আজ আমরা মাতৃভাষাতরুকে ফলপুষ্পে সুশোভিত মহীরুহরূপে অনুধ্যান করতে পারছি।

বিদ্যাসাগর যখন সংস্কৃত কলেজে ভর্তি হন, তখন তাঁর বয়স মাত্র নয় বছর। আমার অপেক্ষা ক্লাসে আর কেহ উৎকৃষ্ট শিক্ষা করতে না পারে, এরূপ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে বিদ্যাভ্যাস করতে ঈশ্বরচন্দ্র চিরকাল আন্তরিক যত্ন পেয়েছিলেন। এমন কি শৈশবকালে প্রায় সমস্ত রাত জেগে পাঠাভ্যাস করতেন। প্রায়ই পিতাকে বলতেন, 'রাত্রি দশটার সময় আহার করিয়া শয়ন করিব, আপনি রাত্রি ১২টা বাজিলে আমায় তুলিয়া দেবেন, নচেৎ আমার পাঠাভ্যাস হইবে না।' পিতা আহারের পর দুই ঘণ্টা বসে থাকতেন। নিকটে আরামাণি গির্জার ঘণ্টাধ্বনি শুনে তাঁর ঘুম ভাঙিয়ে দিতেন। পরে তিনি উঠে সমস্ত রাত্রি অধ্যয়ন করতেন। এরূপ অত্যধিক পরিশ্রম করে মধ্যে মধ্যে তিনি অত্যন্ত কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হতেন। যেমন তিনি পাঠে অনুরক্ত ছিলেন, সেরূপ শিক্ষকগণের প্রতি ভক্তিমান ও সমপাঠীদের সঙ্গে প্রীতির বন্ধনেও আবদ্ধ ছিলেন। লোকে মনে করে থাকে, লিখে পড়ে কৃতী ও কার্যক্রম হওয়ার নামই শিক্ষা। কিন্তু গুরু শিষ্যের ভক্তির সম্বন্ধ, বালকে বালকে সখ্যভাব যে শিক্ষার এক প্রধান অঙ্গ– তা অনেকে জানেন না। সেজন্য বর্তমান শিক্ষা প্রণালীতে ঈশ্বরচন্দ্রের মত মানুষ তৈরি হওয়া একপ্রকার অসম্ভব হয়ে উঠেছে।

নয় বছর বয়সে সংস্কৃত কলেজে ভর্তি হয়ে বাইশ বছরের মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্র কলেজের পাঠ্য সমস্ত বিদ্যায় পারদর্শী হয়ে ওঠেন। এই সময়ের মধ্যে তাঁর অনুজ দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন ও শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন সংস্কৃত কলেজে বিদ্যাশিক্ষা আরম্ভ করেন এবং বিদ্যাসাগর ও দীনবন্ধু ন্যায়রত্নের বিবাহ সম্পন্ন হয়েছিল। সন্তানদের পঠদ্দশায় ভগবতী দেবী চরকায় সূতা কেটে তাদের জন্য বস্ত্র প্রস্তুত করে কলকাতায় পাঠাতেন। তারা মায়ের সেই মোটা বস্ত্র পরিধান করে অধ্যয়নার্থ পটলডাঙ্গায় কলেজে গমন করতেন। তাই তো ঈশ্বরচন্দ্রকে আজীবন মোটা বস্ত্র পরিধান করতে দেখা গেছে। তিনি কখনও সূক্ষ্ম বস্ত্র পরিধান করেননি।

পরিবারের সবাই যেন সহিষ্ণু ও ক্ষমাশীল হয়, ভগবতী দেবী সর্বপ্রযত্নে সেই চেষ্টাই করতেন। ভগবতী দেবী পুত্রকন্যাদের বিলাসিতা ও আত্মসুখ বিসর্জন দিতে শিক্ষা দিতেন। সৌভাগ্যের পরাকাষ্ঠার সময়েও তাঁর মানসিক অবস্থার কোন পরিবর্তন হয়নি। তিনি দীনভাবে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং দীনভাবেই ইহসংসার ত্যাগ করেছিলেন।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ভাগ্যের যথেষ্ট পরিবর্তন ঘটেছিল। বিদ্যাসাগর যখন সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপাল ৩০০ টাকা বেতন পান, পুস্তকাদির আয়ও যথেষ্ট, তখন এক সময়ে কোন কার্যোপলক্ষে বীরসিংহ আগমন করেন। একদিন প্রসঙ্গক্রমে মাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'মা, তোমার কি কি গহনা পরিবার ইচ্ছা হয়?' ভগবতী দেবী বললেন, 'বাবা, অনেকদিন হইতে আমার তিনখানি গহনা পরিবার বড়ই ইচ্ছা আছে। কিন্তু সুযোগ উপস্থিত হয় নাই বলিয়া এযাবৎ তোমাকে বলি নাই। যাহা হউক তুমি স্বয়ং জিজ্ঞাসা করিলে, ভালই হইল। দেখ বাবা, দেশের ছেলেগুলো মূর্খ হইয়া যাইতেছে, ইহাদের বিদ্যাদানের জন্য তুমি একটি দাতব্য বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া দাও, এটি আমার মনে বড় সাধ। আর দেখ দেশের গরীব লোকেরা অর্থাভাবে চিকিৎসা করাইতে পারে না, প্রাণরক্ষার জন্য একটি দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন কর। গরীবের ছেলেরা কোথায় থাকিবে, কোথায় আহার করিয়া বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিবে? ইহাদের আহার ও বাসস্থানের সুবিধার জন্য একটি অন্নসত্রের প্রতিষ্ঠা কর। বাবা! অনেকদিন হইতে, আমার এই তিনখানি গহনা পরিবার বড়ই ইচ্ছা আছে। মায়ের সাধ পূর্ণ করা উপযুক্ত পুত্রের কার্য্য। তুমি আমার উপযুক্ত পুত্র, এখন মাকে গহনা পরাইয়া তোমার মায়ের অনেক দিনের সাধ পূর্ণ কর।'

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের যখন ৫০০ টাকা বেতন, তখন এক কার্যোপলক্ষে দেশে এসে মাকে জিজ্ঞাসা করেন, 'মা, আর তোমার মনে কি সাধ আছে আমায় বল।' ভগবতী দেবী বললেন, 'বাবা, এইবার যেখানে যত দুঃস্থ আত্মীয়-স্বজন আছেন, তাঁহাদের একটা মাসোহারার ব্যবস্থা করিয়া দাও।' বিদ্যাসাগর মায়ের অভিলাষানুযায়ী আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে যাঁদের হীন অবস্থা ছিল, এমন কি সংসারযাত্রা নির্বাহ করা কঠিন হয়ে পড়েছিল, তাঁদের পরিবারে সংখ্যানুযায়ী মাসিক বৃত্তির ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র বীরসিংহ ও নিকবর্তী গ্রামের দীন দরিদ্র অবস্থাহীন ব্যক্তিবর্গকে আপনার সাধ্যমত অর্থসাহায্য করতেন। সন্ধ্যার পর তিনি চাঁদরে টাকা বেঁধে লোকের বাড়ি বাড়ি গিয়ে গোপনে অর্থসাহায্য করে আসতেন। মায়ের ইচ্ছানুসারে ঈশ্বরচন্দ্র নিজ জন্মভূমি বীরসিংহ ও তৎসংলগ্ন পাথরা, কেঁচে, অর্জ্জুনআড়ী, বুয়ালিয়া, রাধানগর, উদয়গঞ্জ, কুরাণ, মামুদপুর প্রভৃতি গ্রামবাসী নিরূপায় লোকদের সাধ্যানুযায়ী নিয়মিত ভোজনের ব্যবস্থা করেছিলেন।

দয়ালু ব্যক্তি পৃথিবীর ভূষণ। সমগ্র পৃথিবী তাঁর দানের ক্ষেত্র। নিম্নভূমিতে যেরূপ জল ধাবিত হয়, সেইরূপ দীন দুঃখী দেখলেই দয়াশীল ব্যক্তির দয়ার স্রোত প্রবাহিত হয়। আবার রমণীহৃদয়ে দয়াবৃত্তি অধিক পরিস্ফুট দেখতে পাওয়া যায়। বিদ্যাসাগরজননী ভগবতী দেবীর দয়া কিন্তু সাধারণ রমণী থেকে অনেকাংশে আলাদা ছিল। তাঁর দয়া অলৌকিক; তা কোন শাস্ত্র বা লোকাচার প্রথায় আবদ্ধ ছিল না। বীরসিংহ ও নিকটবর্তী গ্রামসমূহের অধিবাসীবৃন্দের উপর তাঁর দয়াপ্রবণ হৃদয়ের করুণাবারি সতত বর্ষিত হত। ঈশ্বরচন্দ্র কলকাতা থেকে কয়েকখানি লেপ প্রস্তুত করে দেশে পাঠিয়েছিলেন। গ্রামের কয়েকজন দরিদ্র ব্যক্তি শীতে অতি কষ্টে রাত্রিযাপন করে শুনে ভগবতী ঐ লেপগুলি তাদের দান করেন। পরিশেষে ঈশ্বরচন্দ্রকে পত্র লেখেন, 'তুমি যে কয়েকখানি লেপ পাঠাইয়া দিয়াছ, তাহা গ্রামের কয়েকজন দরিদ্র ব্যক্তিকে দিয়াছি। আমাদের জন্য কয়েকখানি কম্বল শীঘ্র পাঠাইয়া দিবে।'

বিদ্যাসাগরজননী ভগবতী দেবী দয়ার মূর্তিমতী প্রতিকৃতি ছিলেন। তাঁর দয়া ও পরোপকার প্রবৃত্তিই তাঁকে অমর করে রেখেছে। তাঁর এই দয়া প্রবৃত্তির মূলে ছিল সহানুভূতি। তিনি পরের উপকারের জন্যই জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং পরের উপকার করেই জীবৎকাল পর্যবসিত করেছিলেন। তাঁর চরিত্রের আরেক মাহাত্ম্য– বিলাসিতার সঙ্গে পরার্থপরতার দ্বন্দ্ব। তিনি বিলাসিতারূপ ব্যাধিকে পরিবার মধ্যে প্রবেশ করতে দেননি। বিলাসিতার স্থলে মিতাচারের দ্বারা তিনি পরার্থপরতা সাধন করেছিলেন। পরিবারের জনগণের বিলাসিতা ও সুখ-সচ্ছলতার জন্য অধিক ব্যয় করা ছিল তাঁর প্রকৃতিবিরুদ্ধ। তিনি নিজে চরকায় সূতা কেটে মোটা বস্ত্র প্রস্তুত করে পরিবারের সকলের পরিধানের জন্য দিতেন। তিনি অলঙ্কারাদির সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলেন। তিনি বলতেন, 'অলঙ্কারাদি ব্যবহার করিলে পরিবারস্থ স্ত্রীলোকদের মধ্যে বিলাসিতা বৃদ্ধি পাইবে, গৃহস্থালীতে তাহাদের আর সেরূপ মন থাকিবে না। বাটীতে দস্যু তস্করের ভয় হইবে। সে অর্থে অলঙ্কারাদি প্রস্তুত করাইব, সেই ব্যয়ে আমি দশজনকে অন্নদান করিতে পারিব।'

বাল্যজীবনে তাঁর আরেক বিশেষত্ব ছিল, তাঁর দীন ভাব। অহঙ্কার যেন ক্ষণিকের জন্য তাঁর চরণ পর্যন্ত স্পর্শ করতে পারেনি। ভগবতী দেবীর বাল্যজীবনে তেজস্বিতারও বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। দীনতার সঙ্গে তেজস্বিতার সম্মিলন মণিকাঞ্চনসংযোগবৎ তাঁর বালিকা-হৃদয়ে পরম রমণীয় ভাব ধারণ করেছিল। তাঁর মাতুলালয়ের কাছে যে-সব দরিদ্র তেওর ও বাগ্‌দীরা বাস করত, তাদের মাঝে মাঝে তিনি তণ্ডুলাদি আহার্য দ্রব্য এবং বস্ত্রাদি বিতরণ করতেন। একাজ তিনি সুনামের জন্য করতেন না। দরিদ্রের সেবা এবং রুগ্নের শুশ্রূষা তাঁর নিষ্কামপ্রসূত নিত্যক্রিয়া ছিল। তাঁর দানের কথা মামা রাধামোহন বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের কর্ণগোচর হলে তিনি পরম আনন্দিত হন। তাঁর বালিকা ভাগিনীর কার্যকলাপে তিনি যেন এক স্বর্গীয় ভাব দেখতে পেতেন। তিনি বলতেন– 'মা, আমার সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা!' সংসার জীবনে ভগবতী দেবী তার সন্তানদের শিক্ষা দিতেন, 'আমি যদি গৃহে না থাকি, আর কেহ কোন দ্রব্য লইতে আইসে তাহা হইলে, 'নাই' কথা কখন মুখে আনিও না। আমি যে পরিমাণে দিই, সে পরিমাণে না দিলেও, কিছু দিবে। শুধু হাতে তাহাদিগকে ফিরাইয়া দিবে না।' তিনি প্রতিদিন রান্না করতেন এবং পরিবারের সবাইকে সমানভাবে পরিবেশন করতেন। কোন অতিথি উপস্থিত হলে মুখের অন্নে অভ্যাগতের পরিচর্যা করতেন। শেষে হয়তো স্বয়ং উপবাস কিংবা সামান্য জলযোগ

ভগবতী দেবীর এই চিত্রপট প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য: ‘বঙ্গদেশের সৌভাগ্যক্রম এই ভগবতীদেবী এক অসামান্যা রমণী ছিলেন।... অধিকাংশ প্রতিমূর্তিই অধিকক্ষণ দেখার দরকার হয় না। তা যেন মুহূর্তকালের মধ্যে নিঃশেষিত হয়েও যায়। তা নিপুণ হতে পারে সুন্দরও হতে পারে; তথাপি তার মধ্যে চিত্তনিবেশের যথোচিত স্থান পাওয়া যায় না। কিন্তু ভগবতী দেবীর পবিত্র মুখশ্রীর গভীরতা এবং উদারতা বহুক্ষণ নিরীক্ষা করেও শেষ করা যায় না।’

করে সমস্ত দিন যাপন করতেন।

বাল্যকাল থেকেই ভগবতী দেবী মিতাচারিণী ছিলেন। সামান্য পদার্থকেও তিনি তুচ্ছ জ্ঞান করতেন না। তিনি সামান্য মৃন্ময় পাত্রটি পর্যন্ত ফেলে দিতে গেলে বাধা দিয়ে কেড়ে নিতেন এবং যত্ন করে রাখতেন– বিশ্বাস করতেন, এর দ্বারা জগতের কোন মঙ্গল কার্য সাধিত হবে। উৎকৃষ্ট অশন, বসন ও ভূষণে তাঁর আদৌ স্পৃহা ছিল না। সামান্য গ্রাসাচ্ছাদনেই তিনি পরিতুষ্ট হতেন। তিনি বাল্যজীবনেই উপলব্ধি করেছিলেন যে, লালসারূপ বহ্নিশিখা কোনক্রমেই প্রশমিত হয় না, নির্বাণ প্রাপ্ত হয় না– উত্তরোত্তর উপচীয়মান হওয়াই এর ধর্ম। তিনি আত্মসুখ বিনিময়ে পরের সুখ-সাচ্ছন্দ্য বিধান করে সন্তোষরূপ পরমধন লাভ করতে সতত যত্নবতী হতেন। দ্রব্যের অপচয় সম্পত্তি সঞ্চয়ের বিরোধী, সকল দ্রব্য হতেই কোন না কোন প্রয়োজন সাধিত হতে পারে, সেজন্য তিনি অতি সামান্য দ্রব্যও সযত্নে রক্ষা করতেন। ভগবতী দেবীর পারিবারিক জীবনচিত্রে এ কথা স্পষ্ট যে, ছিন্ন বস্ত্র, একগাছি রজ্জু, ভগ্ন মৃন্ময় পাত্র, একগাছি তৃণ পর্যন্তও তিনি সযত্নে রক্ষা করতেন। তিনি সর্বদাই বলতেন, ‘যাকে রাখ সেই রাখে’।

আলস্য ও জড়তাকে ভগবতী দেবী কখনও প্রশ্রয় দেননি। সকালে ঘুম থেকে উঠে প্রাতঃকৃত্য সমাপন করে পুষ্পচয়ন, পুষ্পপাত্রমার্জন ও বিবিধ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গৃহকর্মে তিনি সারাক্ষণ ব্যস্ত থাকতেন। তিনি শ্রমেই শান্তিলাভ করতেন এবং শ্রমেই বিশ্রামসুখ অনুভব করতেন। এ ক্ষেত্রে তার শৈশবের দু’একটি ঘটনার উল্লেখ করা যেতে পারে– ভগবতী দেবীর মাতুলালয়ের গ্রামে ক্ষত্রিয়, রাজপুত, কায়স্থ, নাপিত প্রভৃতি অনেক ব্রাহ্মণেতর জাতির বাস ছিল। তাঁর মাতুলালয়ের সন্নিকটে অনেক দরিদ্র তেওর ও বাগ্‌দী বাস করত। তার কাছে জাতিবিচার ছিল না। তিনি এই সব সমবয়স্কা বালিকার সঙ্গে খেলা করতেন। তিনি সবাইকে বাড়িতে নিয়ে যেতেন, তাদের ব্রতকথা বলতেন, গল্পচ্ছলে নানা কথা শোনাতেন। তাদের কারো কারো কেশবিন্যাস করে দিতেন। সমবয়স্কা বালিকারা খেলার জন্য একত্র হলে, কখনও তাদের তিনি সুমিষ্ট খাদ্যদ্রব্য ভোজন করিয়ে তৃপ্তি লাভ করতেন। সঙ্গিনীদের মধ্যে কেউ পীড়িতা হলে, তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে জাতি-ধর্মনির্বিশেষে তার পরিচর্যা করতেন।

অজ্ঞানকে জ্ঞানদান, দরিদ্রের অভাববিমোচন, বিপন্নের বিপদুদ্ধার, রুগ্নের শুশ্রূষা ইত্যাদি পবিত্র কর্ম ভগবতী দেবীর জীবনে নিত্যই সংঘটিত হত। অহঙ্কার ভগবতী দেবীর হৃদয় স্পর্শ করতে পারেনি। ধনমদে তাঁকে গর্বিত করতে পারেনি। দয়া তাঁর প্রকৃতিসিদ্ধ ধর্ম ছিল। অনুগত-প্রতিপালন ও আশ্রিতবাৎসল্য, তাঁর স্বভাবকে মধুময় করেছিল। তাঁর চরিত্রের আরেক মাহাত্ম্য, তাঁর প্রফুলচিত্ততা। প্রফুল্লচিত্ততা সূর্যালোকের মতন। প্রফুল্লচিত্ত ব্যক্তির কাছে জগতের সামান্য পদার্থও সুন্দর ও সুখকর। প্রফুল্লচিত্ত ব্যক্তি যেমন স্বয়ং সর্বদা সুখী থাকেন, অন্যকেও সেইরূপ সতত সুখী করেন। ভগবতী দেবীর মতন উন্নতহৃদয়া, উদারপ্রকৃতি গুণবতী রমণী সচরাচর দৃষ্টিগোচর হয় না। এমন না হলে কি ঈশ্বরচন্দ্রের মতন পুত্র জন্মে? মায়ের উন্নত হৃদয়ভাব সম্পূর্ণরূপে বিদ্যাসাগরে সংক্রামিত হয়েছিল। তাঁর মতন মাতৃভক্ত পুত্রও অতি বিরল। বৃদ্ধ বয়সেও মায়ের নাম করলে, তাঁর চক্ষুর্দ্বয় অশ্রুপূর্ণ হত। কেউ তাঁর কাছে ভিক্ষা চাইতে এসে যদি বলত, ‘আমার মা নেই’, তাহলে অশ্রুধারায় তাঁর বক্ষঃস্থল প্লাবিত হত। ‘মা’ নাম শুনলে ঈশ্বরচন্দ্র মন্ত্রমুগ্ধের মত হয়ে যেতেন। তিনি সংগীত জানতেন। আর যে সংগীতে ‘মা’ নাম আছে, সেই সংগীত শুনতে তিনি অতিশয় ভালবাসতেন। ‘মা’ নামপূর্ণ সংগীতে তাঁর ভক্তিপ্রবণ হৃদয়ের ভক্তিরস উদ্বেল হয়ে উঠত। এই মাতৃপিতৃভক্ত ঈশ্বরচন্দ্রই একদিন কাশীধামের ব্রাহ্মণদের মাতাপিতার উদ্দেশে বলেছিলেন, ‘তোমাদের বিশ্বেশ্বর, অন্নপূর্ণা কি তাহা আমি জানি না। আমার বিশ্বেশ্বর এই– আর আমার অন্নপূর্ণা এই।’ ঈশ্বরচন্দ্র আজীবন প্রত্যুষে শয্যাত্যাগ করে মাতাপিতার প্রতিকৃতিতে প্রণাম না করে বাড়ি থেকে বের হতেন না।

এ প্রসঙ্গে বিদ্যাসাগরের মাতৃ-আজ্ঞা পালনের একটি ঘটনার কথা জানা যায়– ঈশ্বরচন্দ্রের তৃতীয় ভ্রাতা শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্নের বিবাহোপলক্ষে বাড়ি যাওয়ার জন্য তাঁর প্রতি জননীর সনির্বন্ধ অনুরোধ ছিল। সে-সময় তিনি ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে কর্মরত ছিলেন। মাতৃ-আজ্ঞা পালনের জন্য তিনি উর্ধ্বতন কর্মচারী মার্সেল সাহেবের কাছে ছুটির প্রার্থনা করলেন। কিন্তু ছুটি পেলেন না। ছুটি না পেলে, মাতৃ-আজ্ঞা লঙ্ঘন করা হবে, এই দুঃখে মাতৃভক্ত ঈশ্বরচন্দ্র কিছুক্ষণ নীরবে রোদন করলেন। পরে মাতার আজ্ঞা পালন করা কর্তব্য স্থির করে, পদত্যাগপত্র হাতে সাহেবের কাছে উপস্থিত হলেন। বিস্মিত সাহেব আর ছুটি দিতে দ্বিরুক্তি করলেন না। ছুটি পেয়ে তখনই ভৃত্য সমভিব্যাহারে বিদ্যাসাগর গৃহাভিমুখে যাত্রা করলেন। এদিকে ঘোর বর্ষাকাল। আকাশ ঘন ঘটায় আচ্ছন্ন, সামনে উচ্ছলিত ভয়াবহ দামোদর নদ, পারের উপায় নেই। কিন্তু দৃঢ়প্রতিজ্ঞ মাতৃভক্ত ঈশ্বরচন্দ্র মায়ের নাম স্মরণ করে সেই প্রবল স্রোতোমালাবিশিষ্ট ভয়াবহ দামোদর নদ সাঁতরে পার হলেন। পথে তাঁকে দারুকেশ্বর নদও এইভাবে উত্তীর্ণ হতে হয়েছিল। আর্দ্রবস্ত্রে দৌড়তে দৌড়তে বাড়ি গিয়ে উপস্থিত হয়ে দেখলেন, ভ্রাতা বিবাহ করতে গিয়েছেন; আর তিনি বাড়ি যাননি দেখে মাতৃদেবী ঘরের দরোজা বন্ধ করে কাঁদছেন। বাড়ি ঢুকে তিনি উচ্চৈঃস্বরে ‘মা’ ‘মা’ বলে ডাকতে লাগলেন। পুত্রবৎসলা জননী তাঁর কণ্ঠস্বর শ্রবণমাত্র শশব্যস্ত হয়ে বের হয়ে এলেন। মাকে জড়িয়ে ধরলেন ঈশ্বরচন্দ্র। সে এক অপূর্ব দৃশ্য!

বিদ্যাসাগর-সুহৃদ হ্যারিসন ভগবতী দেবীকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। হ্যারিসন ছিলেন ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে বিদ্যাসাগরের ছাত্র। তিনি ভগবতী দেবীকে খ্রি.পূ. দুই শতকের রোমের প্রবাদপুরুষ রাজনীতিবিদ গ্রাকাস ভ্রাতৃদ্বয়ের (টাইবেরিয়াস ও গাইয়াস ও) মহীয়সী জননী কর্নেলিয়ার সঙ্গে তুলনা করেছিলেন। কর্নেলিয়া তাঁর পুত্রদের পরম পার্থিব সম্পদ, বহুমূল্য রত্ন হিসেবে বিবেচনা করতেন। বাঙালি ঘরের মা ভগবতী দেবী তাঁর চার ছেলেকে দেখিয়ে বলতেন–‘এই আমার চার ঘড়া ধন।’

হ্যারিসন সাহেব ভগবতী দেবীর ছবি এঁকেছিলেন। ছবিটি অদ্যাবধি বিদ্যাসাগর কলেজের অধ্যক্ষের ঘরে রক্ষিত আছে। চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘বিদ্যাসাগর’ (১৮৯৫) গ্রন্থে সর্বপ্রথম এটি মুদ্রিত হয়। ভগবতী দেবীর এই চিত্রপট প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ তাঁর *বিদ্যাসাগর চরিত* (১৩০৩) পুস্তিকায় মন্তব্য করেন: ‘বঙ্গদেশের সৌভাগ্যক্রম এই ভগবতীদেবী এক অসামান্যা রমণী ছিলেন। শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের রচিত বিদ্যাসাগর-গ্রন্থে লিথোগ্রাফ-পটে এই দেবীমূর্তি প্রকাশিত হয়েছিল। অধিকাংশ প্রতিমূর্তিই অধিকক্ষণ দেখার দরকার হয় না। তা যেন মুহূর্তকালের মধ্যে নিঃশেষিত হয়েও যায়। তা নিপুণ হতে পারে সুন্দরও হতে পারে; তথাপি তার মধ্যে চিত্তনিবেশের যথোচিত স্থান পাওয়া যায় না। চিত্রপটের উপরিতলেই দৃষ্টির প্রসর পর্যবসিত হয়ে যায়। কিন্তু ভগবতী দেবীর পবিত্র মুখশ্রীর গভীরতা এবং উদারতা বহুক্ষণ নিরীক্ষা করেও শেষ করা যায় না।’

সরস্বতীরানী পাল সংস্কৃতিকর্মী

BE 100% SURE

Dettol

BPMPA

Proud Partner of icddr,b

ডেটল সাবান সুরক্ষা দেয় ১০০ রোগবাহী জীবাণু পর্যন্ত#

বৈজ্ঞানিক গবেষণায় প্রমাণিত যে নতুন ডেটল সাবান আপনার পরিবারকে ১০০টি পর্যন্ত রোগবাহী জীবাণু থেকে সুরক্ষা দেয়। এজন্যই ডাক্তাররা সবসময় পরামর্শ দিয়ে আসছেন ডেটল ব্যবহার করার জন্য।

নতুন

সুরক্ষা দেয়

১০০

রোগবাহী জীবাণু পর্যন্ত#

This is supported by Microbiological assessments versus bacteria and fungi at an external GLP facility (Bioscience Laboratories, Bozeman, Montana, USA)

** Dettol Original Soap is a Grade-1 soap

DettolBD

ভ্রমণ

চিলিকা হ্রদের দেশে

দীপিকা ঘোষ

তিন.

বর্তমান বিশ্বের প্রায় সব সভ্য দেশেই এয়ার ট্রান্সপোর্টেশনের সিকিউরিটি এ্যাডমিনিস্ট্রেশন, বিমানবন্দরের নিরাপত্তা বৃদ্ধির লক্ষ্যে নতুন নতুন টেকনোলজি ব্যবহারের দিকে বিশেষভাবে মনোসংযোগ করেছেন। অতএব প্লেন থেকে নেমেই কেতাদুরস্ত চেকপয়েন্টের প্যাসেঞ্জার স্ক্রিন সিস্টেমে, হ্যান্ড লাগেজসহ আপাদমস্তক কয়েক দফা কম্পিটারে স্ক্রিনিং হওয়ার পরে এয়ার ইন্ডিয়ার ডিপারচার গেটের সীমানায় যখন পৌঁছনো গেল, শিকাগোর স্থানীয় সময় সকাল দশটার কাঁটা তখন ছুঁইছুঁই করছে। অর্থাৎ সিনসিনাটির স্থানীয় সময় সকাল প্রায় এগারোটা। ভোর তিনটেয় বাড়ি থেকে ছুটতে হয়েছিল নর্দ্যার্ন কেন্টাকি সিনসিনাটির আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে। ব্রেকফাস্টের অভ্যাস অথবা সময়ের পক্ষে সেটা যথোপযুক্ত ছিল না। অতএব ওয়াশরুম থেকে ফিরেই ব্রেকফাস্টের জন্য ছুটতে হল খাদ্যের সন্ধানে। এদেশের বিমানবন্দরে ক্যাফে, বার, কফি শপ, রেস্টুর‍্যান্ট, ছোটখাটো ফাস্টফুডের দোকানের জন্য বিশেষ বিশেষ স্থান নির্ধারিত থাকে। বেশ খানিকটা হাঁটার পরে বাঁয়ে চোখে পড়ল বাবল্‌স্ ওয়াইন বার, শিকাগো ক্লাবস বার এন্ড গ্রিল, টরটাস ফ্রনটেরা, চিল'স টু, গোল্ড কোস্ট ডগস ইত্যাদি ওয়েস্টার্ন ও মেক্সিকান দোকান। আমাদের অভ্যস্ত সকালের জলখবারের সঙ্গে এগুলোর কোনটাই মিলবে না। সুতরাং আরও প্রায় সাত আট মিনিট পথ চলার পরে দেখা মিলল পিজুরিয়া ইউএন, ম্যাকডোনাল্ড'স, ডানকিন ডোনাটস প্রভৃতি পরিচিত নাম।

কথাসাহিত্যিক ও কলাম লেখক দীপিকা ঘোষের জন্মস্থান ফরিদপুর, বাংলাদেশ। বর্তমানে আমেরিকা প্রবাসী। ছেলেবেলা থেকে লেখালেখির সঙ্গে জড়িত। কবিতা দিয়ে শুরু। সমাজের বিচিত্র চরিত্রের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পরবর্তীকালে কথা-সাহিত্যে প্রবেশ। উপন্যাস, ছোটগল্প এবং প্রবন্ধ মিলিয়ে প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা একুশ।

ঢাকা, কলকাতা এবং উত্তর আমেরিকার বিভিন্ন পত্রপত্রিকা ও সংবাদপত্রে তাঁর ছোটগল্প, উপন্যাস এবং প্রবন্ধ নিয়মিত প্রকাশিত হয়।

যত ভিড় ম্যাকডোনাল্ডের সামনে। ইয়েলো, ব্ল্যাক, হোয়াইট, ব্রাউন সবারই সমাগম এখানে। কারণ সব দেশেরই খাদ্যাভ্যাস চলনসইভাবে এখানেই মিলে যায়। আমাদের খাবার আইটেমে এল প্যান কেক, ম্যাপল সিরাপ, গ্রিল করা কয়েক টুকরো বাটারনাট স্কোয়াশ, স্ক্র্যামবল এগ, স্ট্রবেরি জ্যাম আর রেড আপেল। পানীয় হিসেবে চা, কফির পরিবর্তে পেপার গ্লাশে মাইক্রোওয়েভের উষ্ণ জল। ন্যাপকিন আনতে গিয়ে সহসা চোখজোড়া আঁটকে গেল বাদামী চামড়ার সাদাসিধে চেহারার একজোড়া দম্পতির দিকে। লম্বা লাইনে দু'জনেই দাঁড়িয়েছেন ব্রেকফস্ট সংগ্রহ করতে। আমার সঙ্গে চোখাচোখি হতেই ভদ্রলোক লাইন ছেড়ে দ্রুত সামনে এসে দাঁড়ালেন। ইংরেজিতে জিজ্ঞেস করলেন– আপনি বাঙালি নাকি? হ্যাঁ। আমার জবাব শুনে মুখের ওপর স্বস্তির হাসি ফুটল তার। এবার স্পষ্ট বাংলায় বললেন– বাঁচা গেল আপনাকে পেয়ে! এখানে তো চেহারা দেখে কে বাঙালি আর কে নয়, বোঝাই মুশকিল। তবে আপনার হাতের শাঁখা দেখে আমার স্ত্রী বললেন, গিয়ে একবার জিজ্ঞেস করে এস, উনি বাঙালি কিন! হেসে জানতে চাইলাম– কোথায় যাচ্ছেন? দিল্লি হয়ে কলকাতা। আপনারা? দিল্লি হয়ে ভুবনেশ্বর। আমার ন্যাপকিন সংগ্রহ করা হল না। ভদ্রলোক কথা বলতে শুরু করেছেন– আসলে এবারই আমাদের প্রথম এখানে আসা। ছেলে এসেছে পাঁচ বছর আগে। মিজৌরিতে থাকে। ওখানকার এক চিল্ড্রেন হসপিটালে চাকরি করে! বউমার বাচ্চা হল মাস দুই আগে, তাইতেই আসা হয়েছিল মাস দুয়েকের জন্য। আমার স্ত্রীর পক্ষে একা আসা তো সম্ভব নয়, তাই আমাকেও আসতে হল। কিন্তু এখানে আমরা অভ্যস্ত নই... সে জন্যই...! আপনাদের কোন সাহায্য দরকার? না না। সে রকম কিছু নয়। আসলে এখানে কী কী খাবার পাওয়া যাবে তাই নিয়েই...। আমার স্ত্রী আবার কোনরকম মাংসই খান না! তাই এসব ব্যাপারে একটু...! অসুবিধে হবে না। এই ম্যাকডোনাল্ডে মাছ মাংস ছাড়াও অনেক আইটেম আপনি পেয়ে যাবেন। ওপরের লিস্টে তাকালে দেখতে পাবেন, সব রকম খাবারের নাম সেখানে লেখা রয়েছে।

আমাদের খাওয়া একেবারেই শেষের পথে এমন সময়ে খাবার নিয়ে সেই দম্পতি এলেন আমাদের টেবিলে। চারটে চেয়ারের দুটো তখনো ফাঁকা পড়ে ছিল। কয়েক মুহূর্তেই বোঝা গেল ভদ্রমহিলা যেমন কথা কম বলেন, ভদ্রলোক তেমনি বিস্তর। সব রকম ব্যক্তিগত বাক্যালাপেও ভদ্রলোকের জড়তা নেই। বললেন– এইতো দেখুন না এত গরমেও আমাকে স্যুটকেস থেকে বার করে এ রকম তিনখানা ভারী জ্যাকেট চাপাতে হয়েছে গায়ে! ব্যাপারটা কী রকম বিশ্রী ভাবুন! কিন্তু কেন জানেন? ডক্টর ঘোষ প্রয়োজনের বাইরে কথা বলতে অভ্যস্ত নয়। আমাকেই তাই ভদ্রতা করে প্রশ্ন করতে হল– কেন? স্রেফ ওজনের জন্য! সিকিউরিটির ওজন মাপা যন্ত্রে ধরা পড়ল, দুটো স্যুটকেসই ভারী হয়ে গেছে! আমাকে দিয়ে তক্ষুনি তালা খুলিয়ে ওরা বললেন– এইগুলো বার করে নিন! জিজ্ঞেস করলাম– সবই কি ফেলে যেতে হবে? উত্তর এল– সঙ্গে নিতে পারবেন, কিন্তু তার জন্য দুশো ডলার এক্সট্রা দিতে হবে! ভাবলাম– শুধু শুধু অতগুলো ডলার কেন দিতে যাব? নিজের জিনিসই তো! সবগুলো বরং পরেই নিই একসঙ্গে! কিন্তু এগুলোর ওজনও তো আর কম নয়! তার ওপর গরমের দিনে গায়ে এতসব চাপানো... লোকেই-বা ভাবছে কী? বললাম– ভাববেন না। এখানে এসব নিয়ে সাধারণত কেউ মাথা ঘামায় না।

একটি দশাসই চেহারার ব্ল্যাক তরুণ এসে দাঁড়িয়েছে ডানকিন ডোনাটসের সামনে। সাড়ে ছয় ফিটের মত দৈর্ঘ্য। তার সঙ্গে মর্যাদা রক্ষা করেই বিশাল প্রস্থের বপু। সারা মাথার চুল শ'খানিক বিনুনিতে স্কন্ধ জুড়ে ঝুলে আছে। প্রতিটি বিনুনির অর্ধেক অংশ আবার সাদা আর গোলাপী রঙে পেইন্ট করে চিত্রিত। চাঁদির ওপরে লালসবুজ এবং মাথার সামনেটা পুরোই ন্যাচারাল ব্ল্যাক। চোখের ওপর এমন মাপের একজোড়া চশমা বসিয়েছে, যেন নাসার বিজ্ঞানীদের হাবল টেলিস্কোপের মুখ। অবিরাম কথা বলতে বলতে হাসছিল মাঝে মাঝেই। তার রকমসকম দেখে ভদ্রলোক কৌতূহলী হলে বললেন– ছেলেটা পাগল বোধহয়! পোশাক পরিচ্ছদের যা ভাব! তার ওপর নিজের মনে কথা বলতে বলতে একা একাই হাসছে দেখুন! মন্তব্য করা উচিত হয়তো ছিল না। তারপরেও বললাম– একা নয়, ও কারুর সঙ্গে কথা বলছে।

ভদ্রলোক মুখে খাবার পুরেছিলেন। জবাব শুনে বিস্ময়ে হাঁ করে অবাক হয়ে অপলক তাকালেন আমার মুখে– কথা বলছে? কিন্তু কী করে? ওর হাতে তো কোন সেল ফোনই নেই! ও কথা বলছে মাইক্রো ব্লুটুথ

(Bluetooth) ইয়ারপিসে। ঘোষ আমার দিকে তাকাচ্ছে বারবার। বোঝা যাচ্ছে কথা না বাড়িয়ে এবার আমাদের ডিপারচার গেটে ফিরে যাওয়া কর্তব্য। যদিও বোর্ডিং হতে এখনো দেড় ঘণ্টা বাকি। ভদ্রতা বিনিময় করে উঠে পড়লাম সেখান থেকে। কয়েক পা এগিয়ে এসেই ঘোষ মন্তব্য করল– ভদ্রলোক নিজেই একটি আস্ত পাগল!

গেট এম-১০, এখনো ফাঁকা। পাশেই এ্যারাইভাল-ডিপারচারের ইলেকট্রিক বোর্ডগুলেতে বিভিন্ন স্থান থেকে আসা এবং বিভিন্ন স্থানের উদ্দেশে ছেড়ে যাওয়া ফ্লাইটের সংবাদ, আপডেট করা হচ্ছে থেকে থেকে। সেখানে অনুসন্ধানী নজর ফেলতে চোখে পড়ল, অন টাইমেই জার্মানির ফ্রাঙ্কফুর্ট এয়ারপোর্টের উদ্দেশে ছেড়ে যাবে নির্ধারিত এয়ার ইন্ডিয়া। সময়ের দীর্ঘতা হ্রস্বতর হতে হতে বোর্ডিংয়ের মুহূর্ত ঘনিয়ে আসছিল ক্রমাগত। প্যাসেঞ্জাররা উপস্থিত যথা সময়েই। কিন্তু সেই বাঙালি দম্পতির উপস্থিতি দৃশ্যপটে নেই। কে জানে ওদের দিল্লি পৌঁছনোর ফ্লাইট ভিন্ন রুটের বিমানে কিনা। বহু সময় ধরেই দেখতে পাচ্ছি মাঝবয়েসী আঁটসাঁট গড়নের এক দক্ষিণ ভারতীয় ভদ্রলোক, অস্থির ব্যাকুলতায় পায়চারি করতে করতে অধৈর্য হয়ে বারবার দূরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে চলেছেন। আবার চলতে চলতেই মুহূর্তের জন্য সহসা থেমে পড়ে কী ভেবে হাঁটছেন ফের। একখানা কমলা রঙের ধুতি কোচা দিয়ে নয়, লুঙ্গির মত ভাঁজ করে পরিধান করা। কোমরের পেছনে মুষ্টিবদ্ধ হাত দুটি এমন অবস্থায় পড়ে রয়েছে, যেন তারা জটিল সমস্যা সমাধানের জন্য উদগ্রীব রয়েছে পথ খুঁজতে। তার কৌতূহল জাগানো রহস্যাবৃত চালচলন আর আচরণ চারপাশের বহু চক্ষুধারীরই লক্ষ্যযোগ্য হয়ে উঠছে ক্রমে ক্রমে। ভয় হচ্ছে, এমন অপরিচিত কৌতূহল জাগানো দৃশ্যচিত্রের প্রতি আড় নয়নে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে করতেই কেউ না আবার সিনসিনাটি এয়ারপোর্টের মত নিরাপত্তা কর্মীদের উদ্বিগ্ন করে তোলেন। যেখানে পরিত্যক্ত হ্যান্ড ব্যাগের তথ্য-উপাত্ত জানতে ছুটে এসেছিলেন দু'জন সশস্ত্র সিকিউরিটি অফিসার।

একটি কুড়ি-বাইশ বছরের ভারতীয় তরুণ হাস্যোজ্জ্বল মুখে টার্মিনাল তিনের এম-১০ গেটের দিকে দীর্ঘ পা ফেলে এগিয়ে আসছে দ্রুত। দক্ষিণ ভারতীয় ভদ্রলোকের চলমানতা তাতে থেমে গেছে হঠাৎই। কিন্তু মুখের ওপর ছড়িয়ে থাকা বিপুল উদ্বেগের চাপা মেঘ পরিচ্ছন্ন হয়নি সম্পূর্ণ। কাছে এসেই উত্তেজিত তরুণ চারপাশ বিস্মৃত হয়ে সম্ভবত বুকের উদ্বেলতা সামলাতে না পেরেই জোরে ইংরেজিতে উচ্চারণ করল– গ্রাণ্ডপা এ্যাক্সিডেন্টালি ইউ লেফট ইওর পাসপোর্ট এট দ্য চেকপয়েন্ট অফ দ্য সিকিউরিটি! সেখানেই পাওয়া গেছে! ধন্যবাদ ঈশ্বরকে! একজন প্যাসেঞ্জার ভদ্রলাক দেখতে পেয়ে জাস্ট একটু আগেই কাউন্টারে রেখে গিয়েছিলেন! বলেই তরুণ একটি আমেরিকান পাসপোর্ট ধরিয়ে দিল দাদুর হাতে। মাঝ বয়েসীর মুখের ওপর স্বস্তির তরঙ্গ লহরী তুলল। সযত্নে কোটের বুক পকেটে সেখানা রাখতে রাখতে বিস্ময় আর আনন্দ নিয়ে উত্তাল হয়ে বললেন– কিন্তু সিকিউরিটি হবার পরে আমি ওটাকে পকেটেই রেখেছিলাম স্পষ্ট মনে আছে! সে জন্যই তো বারবার তোকে বলছিলাম, এখানে আসার পথটা খুঁজে দেখতে! কারণ অন্যসব জায়গা আগেই খুঁজে দেখেছি! কিন্তু কী করে পাসপোর্টটা পড়ে গেল বল তো? জানি না দাদু! কিন্তু সেটাই ঘটেছে সত্যি! এবার দুশ্চিন্তা বন্ধ করে রিলাক্স কর! তোমার প্রেসার হয়তো এর মধ্যে অনেকখানিই বেড়ে গেছে দেখ! দাদুর চেহারায় এতক্ষণে প্রশান্তির আভাস পরিস্ফুট হল। চারদিকে তাকিয়ে সচেতন হয়ে নিচু স্বরে বললেন– ঠিকই বলেছিস! একটা অভিজ্ঞতা হল বটে! আমেরিকান নাতির মুখেও দেশীয় কায়দায় শান্তভাবে উচ্চারিত হল– সে আর বলতে!

ডিপারচার গেটে কাস্টমার সার্ভিস এজেন্টরা পরিচয়পত্রসহ টিকেটগুলো স্ক্যানিং করে ইলেকট্রনিক রেকর্ড রাখতে রাখতে একে একে যাত্রীদের বোর্ডিংপাস দিতে শুরু করেছেন। এয়ার ইন্ডিয়ার প্যাসেঞ্জারের মধ্যে ভারতীয় জনতার সংখ্যা খানিকটা বৃদ্ধি পেলেও বিভিন্ন কান্ট্রির সাদা যাত্রীদের সংখ্যাও নগণ্য নয়। হয়তো ফ্রাঙ্কফুর্ট থেকে ইউরোপের বিভিন্ন দেশগুলো হবে তাদের গন্তব্যস্থান। দেখতে দেখতে যাত্রীবাহী ভারতীয় বিমান পূর্ণ হয়ে গেল কানায় কানায়। নির্দিষ্ট সময়ে তার ধাতব ডানা মেলে আকাশে উড়াল দিল সে। বিশাল কসমোপলিটান শিকাগো শহর আধা মিনিটেই হারিয়ে গেল স্তরে স্তরে ঠেসে থাকা ভারী মেঘের ঘন আব্রুর আড়ালে। ওপরে শুধু জেগে রইল সূর্যস্নাত নীল রঙের অবিকার সমুদ্র। উন্মুক্ত, অফুরন্ত, ভারহীন মহাকাশ।

বিপুল বোঝাবাহী বিশাল বিমান, গ্রিক পুরাণের বিরাট পাখির

মতোই উড়ে চলেছে ছয় ঘণ্টা ধরে। সামানের ঝুলন্ত ফ্লাট টিভি পর্দায় এখন ভেসে রয়েছে– 'আলটিচিউড ৩৬০০০ ফিট'। অর্থাৎ পৃথিবীর মাটি থেকে ছত্রিশ হাজার ফুট ওপরে আমরা শত শত যাত্রী একটি ধাতব শরীরের মধ্যে ভেসে রয়েছি মহাশূন্যের বুকে। যেদিন রাইট ভ্রাতৃদ্বয় উইলবার ও অরভিল আকাশে ওড়ার স্বপ্ন নিয়ে সফল হয়েছিলেন প্রথ মবার, তখন কি ভেবেছিলেন একদিন বিজ্ঞান প্রযুক্তির নিরন্তর সাফল্য তাঁদের সাধনাকে এমন বিস্ময়কর স্থানে সত্যিই পৌঁছে দিতে সক্ষম হবে? দু'জন বিমানবালা রাতের খাদ্য পরিবেশনের প্রস্তুতি নিচ্ছেন চোখে পড়ল রেস্টরুমের দরজার বাইরে অপেক্ষা করতে করতে। সামনে তিন চারজন অপেক্ষারত নারী-পুরুষ সম্ভবত অনেক আগে থেকেই দাঁড়িয়ে। আমার মুখের ভাব দেখে কিছু অনুমান করতে পেরেই এক রমণী বিরক্তিভরে ফিসফিস করলেন– এই জন্যই সহজে আসতে চাই না! বললাম– কিন্তু প্রয়োজন হলে না এসেও তো উপায় নেই।

ঠিক কথা! ওপাশের রেস্টরুমের সামনেও বিরাট লাইন! কয়েকজনকে দেখলাম ঘণ্টায় ঘণ্টায় ওয়াশরুমের দরজায় গিয়ে দাঁড়াচ্ছেন! ওটাই অবিবেচকদের স্বভাব! অপেক্ষা করতে করতে চলে এলাম এখানে! কিন্তু এখানেও সহজে কিছু হবে বলে মনে হচ্ছে না! আমিও ফিসফিস করলাম– সে রকম সম্ভাবনাই দেখা যাচ্ছে!

রমণীর অভিযোগ মিথ্যে নয়। কারণ ছাড়াও অকারণে অনেকের ঘণ্টায় ঘণ্টায় আসন ছেড়ে বাথরুমে দীর্ঘ সময় ধরে পড়ে থাকার শত শত দৃষ্টান্ত আমারও জানা। কাণ্ডজ্ঞানহীন হয়ে সেখানে টয়লেট টিস্যুপেপার ছড়িয়ে রাখার ঘটনাও বিরল কিছু নয়। পাক্কা পনেরো মিনিট একটানা দাঁড়িয়ে থাকার পরে ভেতরে প্রবেশের মোক্ষম মুহূর্তটি যখন পাওয়া গেল তখন শেষের দিকে দু'পায়ে ব্যালান্স রেখে কষ্ট হচ্ছে দাঁড়িয়ে থাকতে। কারণ প্লেনটা হঠাৎ ভালরকম দুলতে আরম্ভ করেছিল বেশ কিছুক্ষণ আগে থেকেই। বেরিয়ে আসার আগে শুনতে পেলাম ককপিট থেকে ঘোষিত হচ্ছে– আমরা বাজে আবহাওয়ার মধ্যে পড়ে গেছি! যাত্রীদের দ্রুত সিটবেল্ট পরে নিতে অনুরোধ করা যাচ্ছে! দরজা খুলে দেখি, বাইরে কেউই আর তখন অপেক্ষারত নেই। একজন কেবিন ক্রু টাল সামলে কোনমতে আমার পাশ দিয়ে তাড়াতাড়ি সরে যেতে যেতে সভয়ে বললেন– শিগগির ফিরে যান নিজের আসনে! মহাশূন্যের ব্যাপ্তিতে ততক্ষণে অসম্ভব অস্থিরতায় লাফাতে শুরু করেছে এয়ার ইন্ডিয়া অ-৭২৭। যেমন আকাশের উড়ন্ত ঘুড়ি প্রবল বাতাসের প্রচণ্ড ঘায়ে বেসামাল হয়ে ওড়ে। দু'পাশের আসনের সংকীর্ণ প্যাসেজ ধরে দুলে দুলে ফিরে আসতে আসতে প্রত্যেক পলকে ভয়ার্ত ব্যাকুলতায় মনে হতে লাগলো, এক্ষুনি হয়তো ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়বে যাত্রীবাহী দৈত্যাকার ধাতব পাখিটা।

আসন নম্বর ২০-উ তে ফিরে এসে দেখি মিস্টার ঘোষ উদ্বিগ্ন আকুলতায় অপেক্ষা করছে আমার জন্য। বসতে না বসতেই বলল– বাথরুম করে আসতে এত সময় লাগে? এক মিনিটের বেশি লাগেনি। কিন্তু লম্বা লাইন ছিল। চলে এলেই পারতে! পরেও তো যাওয়া যেত! কথা বলার স্পৃহা নেই। প্লেনের ঝাঁকুনিতে বুকের অতল জুড়ে কাঁপছে তখন। কে জানে এখন মহাসাগরের দানবীয় বুকের ওপর দিয়েই উড়ে চলেছে কিনা আমাদের বিমান। অনেক সময় ধরে কম্পার্টমেন্টের শেষ সীমায় ঝুলে থাকা টিভিস্ক্রিনের দিকে লক্ষ্য করিনি। তাই জানা নেই, কোন্ ভৌগলিক সীমানা অতিক্রম করে চলেছি এই মুহূর্তে। এখন অবশ্য কোন দৃশ্যাবলিই আর ভাসছে না টেলিভিশনের পর্দায়। ডান পাশের আসনে বসা এক সাদা মহিলার দিকে নজর গেল। দেখলাম চোখ বুজে বুকের ওপর ক্রস করছেন। ঠোঁট নড়ছে হয়তো নীরব বাক্যের নিঃশব্দ উচ্চারণে। ত্রাণকর্তা যিশুর কাছে সম্ভবত সকাতরে প্রার্থনা জানিয়ে চলেছেন বিপদ থেকে উদ্ধারের জন্য।

এই দুর্ধর্ষ বিপদসঙ্কুল সময়ের প্রতিটি মুহূর্তকে বড় দীর্ঘ বলে মনে হচ্ছে আমার। প্রার্থনা, ভয়, ব্যাকুলতা অনেকের মত আমারও অন্তর জুড়ে একইসঙ্গে মুখরিত হচ্ছে উত্তাল সাগরের ঢেউয়ের মত। ডক্টর ঘোষের পাশে যে সাদা তরুণটি বসেছে তার চেহারাছবি দেখে অনুমান করা কঠিন যে, সাধারণ মানুষের চেয়ে ছেলেটির মানসিক চেতনার বিকাশধারা একেবারেই ভিন্ন রকম। কিন্তু এই শংকিত মূর্চ্ছনার মুহূর্তেও সেটি প্রত্যয় হয়েছে তার আচার আচরণ প্রত্যক্ষ করেই। প্লেনে বিমানবালাদের দেওয়া হালকা জলখাবার খেয়ে বহুসময় সে ঘুমিয়েছিল আপাদমস্তক কম্বলে ঢেকে। প্লেনের প্রচণ্ড ঝাঁকুনিতে সেই নিমগ্ন নিদ্রা সম্ভবত ভেঙে গিয়েছিল এইমাত্র। ঘুম ভাঙতেই আধখানা শায়িত অবস্থা থেকে হঠাৎ সোজা হয়ে উঠে বসল সে। সামনের আসনের পকেটে দলা পাকিয়ে রেখে দিল কম্বলটাকে। তারপর সেই পকেট থেকেই একখানা বই টেনে চারপাশের ঘটনার প্রতি একান্ত নিস্পৃহ হয়ে এমন নিরাসক্ত মনে বই পাঠে গভীর গাঢ়তায় মনোনিবেশ করল, যে দেখে মনে হল যেন তার বাহ্যজ্ঞান লোপ পেয়ে গেছে।

ঝড় থামল ত্রিশ মিনিট ধ্বস্তাধ্বস্তির পরে। প্লেনের অভ্যন্তরে জীবনচাঞ্চল্য ফিরে এল ফের। এয়ার হোস্টেসরা এবার সক্রিয় হলেন রাতের খাবার পরিবেশনে। মেন্যুর ক্যাটালগে, খাদ্যতালিকায় বিস্তর নাম। ভেজিটেরিয়ান মিল, নন ভেজ মিল, সি ফুড মিল। দ্বিতীয় তালিকায় ধর্মসম্বন্ধীয়– মোসলেম মিল, কোশের মিল, হিন্দু মিল, জৈন মিল। তারপর রয়েছে মেডিক্যাল তালিকাও– ডায়াবেটিক মিল, লো প্রোটিন মিল, লো পিউরিন মিল, লো সল্ট মিল, ফ্রুট প্ল্যাটারসহ আরও নানান শ্রেণিবিভাগ। যাই হোক, আমাদের খাদ্য তালিকায় এল– সরু বাসমতি চালের ভাত, এক টুকরো নান রুটি, রোজমেরি মিন্টপেষ্ট দিয়ে চিংড়ি মাছের কারি, ডাল গাজর এ্যাসপারাগাস সিদ্ধ, সঙ্গে জলপাইয়ের সালাদ আর চিজ কেক।

পাক্কা এগারো ঘণ্টা আকাশে উড়ে এয়ার ইন্ডিয়া অ-৭২৭ এখন ফ্রাঙ্কফুর্ট ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টে স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে। এক ঘণ্টা পনেরো মিনিট এখানে হল্ট্ করার কথা তার। বিভিন্ন কম্পার্টমেন্ট থেকে দলে দলে যাত্রীরা ক্যারি অন লাগেজ নিয়ে নেমে যাচ্ছেন বিমান থেকে। এগারো ঘণ্টা ধরে বিরামহীন ব্যবহৃত ওয়াশরুম ব্যবহারের উপযোগী নেই ভেবেই আমরা উঠে দাঁড়িয়েছিলাম পাসপোর্ট ও বোর্ডিংপাসসহ। উদ্দেশ্য, এয়ারপোর্টে নেমে হাতমুখ ধুয়ে পরিচ্ছন্ন হয়ে নেওয়া। কিন্তু হঠাৎই সিকিউরিটির দুই বিশালবপু পুরুষ অফিসার, তুফান হয়ে এমনভাবে ছুটে এলেন সেখানে, যে অধিকাংশ যাত্রীই তাদের আবির্ভাবে বিব্রত হয়ে পড়লেন। একজনের জলদগম্ভীর কণ্ঠে নির্দেশ শোনা গেল– যারা জার্মানির প্যাসেঞ্জার নন, এখান থেকে তাদের বাইরে বেরুনো একদম নিষেধ! নাঃ! একদম নয়! বসে পড়ুন, এক্ষুনি বসে পড়ুন! বলেই এক ভদ্রলোককে বসিয়ে দিয়ে ওপরের লাগেজ অনুসন্ধানের কাজে লেগে পড়লেন ত্বরিত গতিতে। কারণটা সঙ্গে সঙ্গেই জানা গেল– এখানে যেসব লাগেজের মালিককে আমরা চিহ্নিত করতে পারব না, সে-সব মালামাল প্লেনের বাইরে চলে যাবে! আমরা এই কাজটাই এখানে করতে এসেছি! মিথ্যে বাগাড়ম্বর নয়, চলে যাবার আগে সত্যি সত্যিই মালিকহীন চার পাঁচটা লাগেজ নিয়ে তারা বেরিয়ে গেলেন দশ মিনিটের মধ্যেই। ঘোষ এবার কথা বলল– তার মানে দাঁত ব্রাশটাও করা যাবে না আজ!

দ্বিতীয় দফায় যারা এলেন তারা নারী হলেও ললিত নন। রীতিমত কঠোর ও কর্কশ। আদেশের সুর ধ্বনিত হল তাদের কণ্ঠেই বেশি– আপনারা প্রত্যেকে পাসপোর্ট আর বোর্ডিংপাস বার করুন! আমরা ওগুলো দেখতে চাই! পুরো কম্পার্টমেন্ট ঘুরে দেখতে পনেরো মিনিটেরও বেশি সময় কেটে গেল দু'জনের। দুই দক্ষিণ এশীয় নারী এতসব কাণ্ডের পরেও আশ্চর্যভাবে সংকীর্ণ প্যাসেজ জুড়ে পদচারণা করছিলেন অনেক সময় ধরে। যেন সেটি একটি খোলা মাঠের উন্মুক্ত প্রান্তরের চরাচর; চাইলেই যথেচ্ছভাবে বিচরণ করা চলে। কাছে এসে দুই জার্মান নারীর একজন সরোষে প্রতিবাদ করলেন তার– কেন এখানে এভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছেন আপনারা? প্যাসেজটা কি ঘুরে বেড়াবার জায়গা বলে মনে হয়? যান! নিজের সিটে গিয়ে বসুন! ধমকের বহর দেখে অনেকেরই বোধহয় হৃদয়ঙ্গম হল, এই নারীরা জার্মান চরিত্রেরই প্রতিনিধিত্ব করছেন– যারা প্রচলিত পদ্ধতিগত নিয়ম কানুন, আইন, রীতির শিথিলতা কোনভাবেই সহনীয় পর্যায়ে বরদাস্ত করে নিতে অভ্যস্ত নন– যেটা এই জাতির রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ব্যবসায়িক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও একইভাবে প্রযোজ্য।

● পরবর্তী সংখ্যায়

দীপিকা ঘোষ
প্রবাসী বাঙালি কথাসাহিত্যিক

গীতা দত্ত

এমিলি জামান

‘ওয়াক্ত নে কিয়া...
কিয়া হাসিন সিতম
তুম র‍্যাহে না তুম
হাম র‍্যাহি না হাম...’

‘ওয়াক্ত’ অর্থাৎ সময় আক্ষরিক অর্থে অবশ্যই অস্থায়ী কিন্তু সময়ের অবয়বে সুরভি ছড়িয়ে দিলে সময় হারিয়ে গেলেও, রয়ে যায় সৌরভের রেশ। বিগত শতকের চল্লিশের দশক থেকে সত্তরের দশকের প্রথমাবধি (১৯৪৬-১৯৭১) যাঁর প্রগাঢ় কণ্ঠের সৌরভে ভারতীয় সংগীতজগত আমোদিত, তিনি আজ অন্যভুবনের বাসিন্দা। অকাল প্রয়াতা। কিন্তু দৈহিক মৃত্যুকে উপেক্ষা করে লক্ষ-কোটি সংগীতপিপাসুর শ্রবণে ও চিত্তে বর্ণিল কণ্ঠের শিল্পী গীতা দত্ত আজও অম্লান। গীতার জীবনভ্রমণও তাঁর কণ্ঠের মতই বর্ণময়। পূর্ববাংলার ফরিদপুর আর ভারতের মুম্বই– দূরত্বটা কিঞ্চিৎ দীর্ঘ হলেও সৌভাগ্যক্রমে স্থান-কাল-পাত্রের শুভ-সমন্বয়ে গীতা অনায়াসে পেরিয়ে গিয়েছিলেন এই দূরত্ব। পশ্চিমবাংলার সংগীতাঙ্গন আর সুদূর মুম্বইয়ের ফিল্মি-গানের জগত এই ব্যতিক্রমী শিল্পীর কণ্ঠ-প্রাচুর্যে ঐশ্বর্যমণ্ডিত হয়েছিল। গানপাগল শ্রোতারা আজও ভোলেননি ‘এই সুন্দর স্বর্ণালী সন্ধ্যায়’, ‘তুমি যে আমার’, ‘নিশিরাত বাঁকা চাঁদ’, ‘ওয়াক্ত নে কিয়া’, ‘জানে কিয়া তুনে ক্যাহি’ প্রভৃতি গান।

প্রারম্ভের ঘণ্টাটি বাজিয়েছিলেন কে হনুমান প্রসাদজী। গীতাকে দিয়ে গাইয়েছিলেন পৌরাণিক কাহিনিভিত্তিক চলচ্চিত্র ‘ভক্ত প্রহ্লাদ’-এ। রেকর্ডিং স্টুডিও-য় উপস্থিত সবাইকে যোড়শী গীতার সুররঞ্জিত সতেজ কণ্ঠ চমকে দিয়েছিল।

পূর্ণ প্রাণশক্তি দিয়ে গীতা চালিয়ে গেলেন তাঁর সংগীতভ্রমণ। একে একে জিতে নিলেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, নচিকেতা ঘোষ, অমল মুখোপাধ্যায়, এস ডি বর্মণ, ও পি নাইয়ার, মদন মোহন প্রমুখ গুণী সুরনির্মাতার মন। চুটিয়ে গাইলেন গুচ্ছের ফিল্মি ও নন-ফিল্মি গান। ভজন থেকে শুরু করে ক্লাব সং– সব ধরনের গানেই তাঁর পারঙ্গমতা ঈর্ষণীয়। বাংলা ও হিন্দি ছাড়াও আরো বেশ ক’টি ভারতীয় ভাষার গানে কণ্ঠ দিয়েছেন এই প্রতিভাময়ী। গুণী পরিচালক-অভিনেতা গুরু দত্তের জীবনসঙ্গিনী হবার সৌভাগ্য ঘটেছিল তাঁর। গীতার ফিল্মি হিন্দি গানের ক্যারিয়ারে গুরু দত্তের সহযোগিতা অর্থপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। কিন্তু সৌভাগ্যবান জীবনসঙ্গী হতে পেরেও গুরু দত্ত নিজেকে একনিষ্ঠ প্রমাণ করতে পারেননি। প্রতিভাময়ী অভিনয়শিল্পী ও নৃত্যপ্রতিভা ওয়াহিদা রেহমান গুরুর রোমান্টিক হৃদয়ে ঝড় তুলেছিলেন। ফলাফল শান্তিপূর্ণ হল না। ওয়াহিদা বিবাহিত গুরু দত্তকে ভালবাসলেও কোন পরিষ্কার সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারলেন না। এদিকে গুরু-গীতার পরিণয়বন্ধনও ছিন্ন হল। মানসিক আঘাতে ভেঙে পড়লেন গীতা। গুরু দত্ত বেছে নিলেন আত্মহননের পথ আর হতাশা-জর্জরিত গীতা অনিয়মিত জীবনাচরণের শিকার হয়ে লিভার-সিরোসিজে আক্রান্ত হলেন। মাত্র একচল্লিশ বছর বয়সে অসংখ্য শ্রোতা ও অনুরাগীকে কাঁদিয়ে তাঁরই সুরে ছাওয়া পৃথিবীকে অপ্রত্যাশিতভাবে বিদায় জানালেন এই প্রতিভাময়ী শিল্পী। দিনটি ছিল ১৯৭২ সালের ২০ জুলাই।

গীতার রেকর্ডকৃত গানের সংখ্যা প্রায় তেরশো। জাদুকরী কণ্ঠের অধিকারিণী এই প্রয়াত শিল্পীকে সম্মান ও শ্রদ্ধা জানাতে ভারতীয় ডাক বিভাগ ২০১৩ সালের ৩ মে তাঁর মুখচ্ছবি সংবলিত ডাকটিকেট প্রকাশ করে। অকালে ঝরে যাওয়া পুষ্পতুল্য এই সংগীতকন্যাকে স্মরণ করতে গিয়ে কবিগুরুর গানের ভাষায় বলতে হয়–

‘যে ফুল না ফুটিতে ঝরেছে ধরণীতে,
যে নদী মরুপথে হারালো ধারা,
জানি হে জানি তা হয়নি হারা।’

এক জীবনে সব ‘পূজা’ হয়তো শেষ করা যায় না, কিন্তু জীবন অর্থহীন হতে পারে না। স্বল্পদৈর্ঘ্য জীবনে সংগীত কোষাগারে গীতা যে অমূল্য রত্ন জমা রেখে গেছেন তার সুবর্ণ-দ্যুতি অক্ষয় হয়ে থাকবে।

• এমিলি জামান সংস্কৃতিকর্মী

১ ॥ ২৭ মে ২০১৬ সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় গুলশানের আইজিসিসি মিলনায়তনে জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের জন্মবার্ষিকীতে খিলখিল কাজী ও সালাউদ্দিন আহমেদের নজরুল সংগীত পরিবেশন

২ ॥ ২৮ মে ২০১৬ সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় গুলশানের আইজিসিসি মিলনায়তনে জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের জন্মবার্ষিকীতে ড. প্রদীপ কুমার নন্দীর নজরুল সংগীত পরিবেশন

৩ ॥ ৩১ মে ২০১৬ সকাল সাড়ে ১০টায় গুলশানের আইজিসিসি মিলনায়তনে ঢাকাস্থ ভারতীয় হাই কমিশন ও শ্রীলংকান হাই কমিশনের উদ্যোগে 'দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় বৌদ্ধ সংস্কৃতি ও সভ্যতা' শীর্ষক আলোচনায় বক্তব্যরত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পালি ও বৌদ্ধ চর্চা বিভাগের অধ্যাপক সুকোমল বড়ুয়া

৪ ॥ ২ ও ৩ জুন ২০১৬ সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় যথাক্রমে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আর সি মজুমদার হল ও গুলশানের আইজিসিসি মিলনায়তনে দীপক কুমার চক্রবর্তীর তবলা এবং পার্থপ্রতিম রায়ের সেতার বাদন

৫ ॥ ৪ জুন ২০১৬ গুলশানের আইজিসিসি মিলনায়তনে বাংলাদেশের প্রখ্যাত রবীন্দ্র সংগীত শিল্পী অদিতি মহসিনের রবীন্দ্র সংগীত পরিবেশন

Regd. No. DA 355 Bharat Bichitra July 2016

সত্যমেব জয়তে

ভারতীয় হাই কমিশন, ঢাকা

জ্ঞাতব্য তথ্য

নতুন আইভিএসি কেন্দ্র

ইন্ডিয়ান ভিসা অ্যাপলিকেশন সেন্টার (আইভিএসি)-এর মাধ্যমে ভারতীয় ভিসা আবেদন গ্রহণের জন্য ভারতীয় হাই কমিশন, ঢাকার স্বীকৃত এজেন্ট এস্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া (এসবিআই) আনন্দের সঙ্গে ঘোষণা দিচ্ছে যে, এখন থেকে ভিসার আবেদনপত্র গ্রহণ ও বিতরণের জন্য ঢাকার উত্তরাসহ বরিশাল, ময়মনসিংহ ও রংপুরে নতুন আইভিএসি খোলা হয়েছে।

কার্যক্রমকাল

রবিবার থেকে বৃহস্পতিবার– আবেদনপত্র গ্রহণ সকাল ৮.০০টা থেকে দুপুর ১.০০টা।
রবিবার থেকে বৃহস্পতিবার– আবেদনপত্র বিতরণ বিকাল ৩.০০টা থেকে সন্ধ্যা ৬.০০টা।

ঠিকানা

আইভিএসি-র সব কেন্দ্রে সব ধরনের ভিসা আবেদন গ্রহণ করা হয়। বাংলাদেশে এখন নিম্নোক্ত আইভিএসি কেন্দ্রে বিদ্যমান। এগুলো হচ্ছে: আইভিএসি, গুলশান, ঢাকা ॥ আইভিএসি, মতিঝিল, ঢাকা ॥ আইভিএসি, ধানমন্ডি, ঢাকা ॥ আইভিএসি, উত্তরা, ঢাকা ॥ আইভিএসি, চট্টগ্রাম ॥ আইভিএসি, সিলেট ॥ আইভিএসি, খুলনা ॥ আইভিএসি, রাজশাহী ॥ আইভিএসি, বরিশাল নর্থ সিটি সুপার মার্কেট দ্বিতীয় তলা, বরিশাল সিটি কর্পোরেশন, অমৃতলাল দে রোড, বরিশাল (এলাকা: বরিশাল, বরগুনা, ভোলা, ঝালকাঠি, পটুয়াখালী ও পিরোজপুর) ॥ আইভিএসি, ময়মনসিংহ, ২৯৭/১ মাসকান্দা দ্বিতীয় তলা, মাসকান্দা বাসস্ট্যান্ড, ময়মনসিংহ (এলাকা: জামালপুর, কিশোরগঞ্জ, ময়মনসিংহ, নেত্রকোনা, শেরপুর, টাঙ্গাইল ও ভালুকা) ॥ আইভিএসি, রংপুর, জে বি সেন রোড, রামকৃষ্ণ মিশনের বিপরীতে, মহিগঞ্জ, রংপুর (এলাকা: রংপুর, দিনাজপুর, কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা, নীলফামারী, পঞ্চগড়, ঠাকুরগাঁও এবং লালমনিরহাট)। উল্লেখ্য, ঢাকার বাইরের এলাকার ভিসা আবেদন ঢাকার কোন কেন্দ্রে গ্রহণ করা হবে না।

ভিসা আবেদন করার সময় আবেদনকারীদের সঠিক বিভাগ নির্ধারণ করে আবেদন করতে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। সব দলিল সঠিক, সম্পূর্ণ ও অবিকল হওয়া চাই। আবেদনকারীদের এজেন্ট ও মধ্যবর্তী মানুষদের ব্যাপারে সতর্ক থাকার এবং এসব ক্ষেত্রে নিকটতম থানা/আইন প্রয়োগকারী কর্তৃপক্ষকে জানানোর পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। আইভিএসি বাংলাদেশে তার পক্ষে কাজ করার জন্য কোন ব্যক্তি/সংস্থাকে অনুমোদন দেয়নি।

পুনর্নির্ধারিত প্রক্রিয়া ফি

১ জানুয়ারি ২০১৫ থেকে পুনর্নির্ধারিত ভিসা প্রক্রিয়া ফি নিম্নোক্ত হারে কার্যকর হবে: ১. ঢাকার সব আইভিএসি কেন্দ্র– বাংলাদেশী টাকা ৬০০.০০। ২. আইভিএসি, চট্টগ্রাম– বাংলাদেশী টাকা ৬০০.০০ ॥ ৩. আইভিএসি, রাজশাহী– বাংলাদেশী টাকা ৬০০.০০ ॥ ৪. আইভিএসি, সিলেট– বাংলাদেশী টাকা ৭০০.০০ ॥ ৫. আইভিএসি, খুলনা– বাংলাদেশী টাকা ৭০০.০০ ॥ ৬. আইভিএসি, বরিশাল– বাংলাদেশী টাকা ৭০০.০০ ৭. আইভিএসি, ময়মনসিংহ– বাংলাদেশী টাকা ৭০০.০০ ॥ ৩. আইভিএসি, রংপুর– বাংলাদেশী টাকা ৭০০.০০।

আলোকচিত্র আপলোডের নতুন পদ্ধতি:

আবেদনকারীদের অনলাইন আবেদনপত্রে দেওয়া নির্ধারিত জায়গায় তাদের আলোকচিত্র স্ক্যান করে আপলোড করতে হবে। স্ক্যানকৃত আলোকচিত্র ছাড়া আবেদনপত্র অসম্পূর্ণ বলে বিবেচিত হবে।

হেল্পলাইনসমূহ

হেল্পলাইন টেলিফোন/ফ্যাক্স/ ই-মেইলসমূহ: ০০-৮৮-০২ ৮৮৩৩৬৩২২ ॥ ০০-৮৮-০২ ৯৮৯৩০০৬ ॥ ০০-৮৮-০১৭১৩ ৩৮৯৪৯৯ ০০-৮৮-০২ ৯৮৬৩২২৯ (ফ্যাক্স) ॥ visahelp@ivacbd.com. আরো সাহায্যের জন্য ই-মেইল: visahelp@hcidhaka.gov.in
ভিসা আবেদন প্রক্রিয়া সংক্রান্ত যে-কোন ধরনের প্রশ্নের জবাব পেতে ভিজিট করুন: http://www.ivacbd.com/faq.php

জনস্বার্থে ভারতীয় হাই কমিশন, ঢাকা কর্তৃক প্রচারিত